ভাতের ভূগোল

ভাতের ভূগোল

জুয়েল মোস্তাফিজ

ঐতিহ্য

ভাতের ভূগোল
জুয়েল মোস্তাফিজ

প্রকাশক
আরিফুর রহমান নাইম
ঐতিহ্য
রুমী মার্কেট ৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড
বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

প্রকাশকাল
মাঘ ১৪১৬
ফেব্রুয়ারি ২০১০

প্রচ্ছদ
==

মুদ্রণ
ঐতিহ্য মুদ্রণ শাখা

মূল্য
==== টাকা

BHATER BHUGOL (geography of rice) by Jewel Mostafiz.
Published by Arifur Rahman Nayeem
Oitijjhya.
Date of Publication : February 2010.

website: www.oitijjhya.com
Email: oitijjhya@gmail.com

Copyright 2010 Oitijjhya. All rights reserved,
including the right of reproduction in
whole or in part in any form.

Price: Taka ==.00 US$ ==.00
ISBN 984-70193-===

উৎসর্গ

মাতাল পিন্টু কাকাকে বলেছিলাম; কাকা, দুপুরে
ভাত খেয়েছ? কাকা বলেছিল, 'আমি ভাত খাব কেন! আমি তো নিজেই একটা ভাত...'

পাগলের সর্দার ঢিণ্ডারা ক্ষ্যাপাকে একদিন বলেছিলাম, তুমি কখনো ভাত খেয়েছ? ঢিণ্ডারা বলেছিল, 'আমি সম্ভবত কোনোদিন ভাত খাইনি, কেননা আমার বারবার ক্ষুধা লাগে... '

ক্ষুধার্ত নীলকণ্ঠের কাছে গিয়েছিলাম, সে বলেছিল, 'আমি ভাত খাব না! ভাতই আমার ঈশ্বর...'

জানি উদ্বাস্তুর কোনো মানচিত্র নেই
তাইতো তোমাদের কাছেই রেখে গেলাম
ভাতের ভূখণ্ড...

প্রবেশ পথের কবিতা

ভা তে র স খা, ভা তে র স খি

মাড়ন পর্ব...

যে তুমি মানব অন্তর খেয়েছ এক থালা ভাত তুমিই সর্বজ্ঞানী। প্রাণের সাথে পাল্লা দিয়ে একথা বলেছিল মাড়নচক্রের হাওয়া। কে তুমি ভাতের অন্তর! মানব অন্তরে চিরকাল করিতেছ খেলা? তাইতো প্রাচ্যের সমস্ত ভাতের থালা কোনো এক অন্ধকারে দুঃস্বপ্ন দেখে ফেলে, আর বলে প্রতিটি ভাতের আছে অসংখ্য মুখ। তবে কি একটি ভাতের ভেতর থেকে গেল মহাকালের না বলা কথার ভার? বুঝি না তো কোনোদিন ভাতের ছলাকলা! তাইতো মানব অন্তরের ঘুমের ভেতর জেগে ওঠা যতসব গোলমাল সবই ভাতের কথা। তাইতো মানব অন্তর ছুটে গিয়েছিল মাড়নের মাঠে আর সেখানেই ভাতজন্মের আগুন হাতে দাঁড়িয়ে ছিল জড়াজড়ি করে থাকা দুটি ভাত। মাটির গভীরে চিরকাল জ্বলে থাকা আগুন যা কিনা মাটির অন্তর ধসে ধসে ভাতের চোখে হয়েছে আলো। আর একি অন্ধ আলো নেমে এল মাড়নের মাঠে, অসংখ্য ভাতের ভিড়ে দেখা গেল কেবল ওই দুটি ভাতই খেলিতেছে চোখ বদলের খেলা। প্রতিটি প্রহরে তারা একে অপরের চোখ বদল করে। আর এভাবেই মাটির গোপন রক্তের ভেতর ঘুরতে ঘুরতে ওরা হয়ে গেল ভাতের সখা ভাতের সখি। আর একদিন যখন মাড়নের শেষ প্রহর এসে পড়ল তখন ভাতের সখা গা ভরে নিল জলবায়ু, ভাতের সখি প্রাণে মাখল মাটির আকাঙ্ক্ষা...

গোলাঘর...

তবে কি ভাত দুটির চোখ ছিল সবুজ? তবে কি সমস্ত আলো এসে ভাতের চোখে দিয়ে গেল সূর্যের আত্মাহুতির আগাম খবর? কৃষক অন্তর এবার যখন ভাতগুলোকে মাড়নের মাঠ হতে নিয়ে গেল গোলাঘরে তখন ভাত দুটি তাদের আত্মাকে বানাল ক্ষুধার ঘুড়ি, তাদের মৃত্যুর জলকে বানাল মহাশূন্যের ঘাম, আর সে ঘাম থেকে ফুটতে লাগল বিক্ষিপ্ত তারা, ভাতের সখা বলে, 'আমার রক্তে ভাসে সময়,' ভাতের সখি বলে, 'সময় বলতে কিছু নেই, রক্তই সময়।'

আর এভাবেই বস্তার ভেতর কোটি কোটি ভাতের মতো তারাও সূর্যের তাপে হলো স্বাদের আধার। আর সেই দুর্বিপাকের গুহা ভাপাখানার ভেতর পুড়ে পুড়ে অনন্ত জ্ঞানের আলোতে ভরে গেল তাদের প্রকোষ্ঠ মগজ। তবে কি ভাতগুলো মানব অন্তরের প্রকৃত বিচার জেনেছিল? ভাতগুলো সহসাই জেনে গেল তাদের আরো কিছুদিন গোলাঘরে থাকতে হবে। তাইতো তারা আত্মাহুতির গান গেয়ে গেয়ে ঢুকে গেল গোলাঘরে। শুধু কি তাই, ভাতের তাপে গোলাঘরটা দিনরাত বাজে। কে বাজায় প্রাণের ঢুলি আর কেমন করেই বা বাজে ভাতের গোলাঘর? কোনো এক ভাতের মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে আসে, যেভাবে বাজে মানব অন্তর! তাইতো কখনো কখনো ভাতের আয়ুর কাণ্ড বেড়ে যায়, চলে যায় অনন্তের দিকে। কখনো কখনো ভাতগুলো তাদের পূর্বপুরুষের আত্মার সন্ধানে নাচে গায় আর মাথায় বাঁধে অনাগত কালের অন্ধকার। কে এই অন্ধকার যার ভেতর পৃথিবী খালি পায়ে হাঁটে? ভাতের মগজে সেই অন্ধকার, ক্ষুধার দুগ্ধরূপে জেগে থাকে চিরকাল। আর কেনইবা ভাতের কপালে জমে আছে দুর্ভাগ্যের ফড়িং? ভাতের কপালে পাওয়া গেল মানব অন্তরের আয়ুর সীমান্ত। তাইতো ভাতের সখা পরম মমতায় ভাতের সখিকে বলে, 'তোমার পিঠের রঙ্গগুলো মেলে ধর' আর ভাতের সখির রঙ্গে দেখা গেল পাহাড়, পর্বত, আকাশ, নদী আর হাজার বছরের মানব অন্তরের জীবাশ্ম...

ভাতের সখা এবার তার মাথার খুলি জমা দিল গোলাঘরের অন্তরে। তবে কি ভাতগুলো জেনে গেল মানব অন্তরে বিরাজ করা ভূখণ্ডের ত্রিভঙ্গ খেলা। একি বিস্ময়কর ভাতের চোখ! অশ্রুহীন কান্নায় ভেঙে ফেলছে তাদের মাথার কাদামাটির অন্ধকার। আর অন্ধকারগুলো পৃথিবীর দিকে যেতে যেতে, ক্ষুধার দিকে যেতে যেতে হয়ে যাচ্ছে কালো

কালো বেড়াল। কবে যে তারা ক্ষুধার বাজারে বিক্রি হয়ে যাবে? এই ভাবনায় উৎপীড়ন আর আকুতি ফুটে গেল ভাতের সবুজ চোখে। কালই হয়ত নিভে যাবে সেসব চোখে ফুটে থাকা সোনা রুপার ফুল। কৃষক
অন্তর এবার ভাতগুলোকে বস্তার ভেতর স্থানান্তর করল। তাইতো ভাতের সখা সখি তাদের ঘামের কৌশলের কাছে দিনরাত প্রার্থনা করে, মানব অন্তর যেন তাদের এক অন্তরে রাখে...

ভাতের বাজার...

তবে কি ভাতের আরো কোনো প্রার্থনা আছে? ভাতের প্রার্থনা তো কেবল আত্মাহুতি? ভাত ডাকে পৃথিবীকে, পৃথিবী ডাকে ক্ষুধাকে, সূর্যের উদাম জঙ্গল থেকে ছুটে আসে ক্ষুধার পাখিরা, ভাতের গায়ের গন্ধে মাতাল হয়ে ওঠে মহাকাল। এবার ভাতের সখা সখি পৃথিবীর সমস্ত প্রার্থনার মুখে আগুন দিল আর বসে গেল অচেনা এক প্রার্থনায়। ভাতের কাছে নাকি এক উত্তর আছে, ভাত তাই প্রশ্নটি খোঁজে, সেই উত্তরের গায়ে প্রার্থনার পোকাগুলি গান হয়, প্রাণ হয়, বেরঙের রঙ মাখে। তাইতো ভাত দুটির অন্তর হয়ে গেল শাদা। আর কোনো এক বস্তার ভেতর তারা চলে এল বাজারে। তবে কি মানব অন্তর ভাতের প্রার্থনা জানে? নইলে কেনইবা এত ভাতের ভিড়ে ওই দুটি ভাত একই বস্তার ভেতর? নাকি ওই ভাত দুটি ছিল চন্দ্রগ্রহণের প্রকৃত কারণ। ভাতের সখা যখন কৃষক অন্তরের কল্যাণে কোনো এক বস্তার ভেতর চলে এসেছিল, তখনই ভাতের সখি ছিটকে পড়েছিল মাটিতে। আর ভাতের সখি প্রাণ থেকে ছিঁড়েছিল আত্মচিৎকারের নীলপদ্ম। আর কৃষক অন্তরের দিকে চেয়ে চেয়ে বলেছিল, 'মানব অন্তর তোমার প্রাণের দোহাই, আমায় ওই বস্তার ভেতর প্রেরণ কর।' কৃষক অন্তর কি আর শুনতে পায় ভাতের আত্মচিৎকার? তাইতো বস্তার মুখ লাগানোর ফাঁকে সে চিৎকার শুনেছিল কৃষাণীর মুঠোভরা হাতের অন্তর... আর এভাবেই ভাতের শঙ্কার ঘরে বেজেছিল ভাতের প্রেমের শঙ্খ।

ভাতের সখা সখি বাজারে এসে দেখে ক্ষুধার যজ্ঞ হতে আসা কত সব মানব অন্তর তাদের অন্তরের দাম দর করে। ভাতের সখাটি শুনতে পায় আরো কিছু কালের পদধ্বনি। ভাতের সখি বস্তার ভেতর থেকে মানবের মুখ দেখে কাঁদে। কেন এই কান্না? ভাতের অসংখ্য মুখের

সাথে মানবের এক মুখের কী এমন যোগাযোগ? তবে কি ভাতের পতাকা চিরকাল কাঁদে, ভাতের চোখ তো ক্ষুধার আয়না। ভাতের কান্না থেকে ঝরে বায়বীয় পাথর। আর প্রতিটি পাথরে জেগে আছে আত্মাহুতির প্রকৃত রেখা। আর এভাবেই ভাতের সখাটি তার ভাতসখির প্রাণের ত্রিভুজ ছুঁয়ে বলে, 'এসো, আমরা মিলনের শামুকগুলো গুনে রাখি। দেখ না ক্ষুধার যজ্ঞে বেজে উঠেছে আমাদের মরণ মুদ্রা, আমাদের রক্তের বায়স্কোপে এসেছে ডাকাতি সময় বিচ্ছিন্নতার ছুরি হাতে। কখন যে কার পাকস্থলী হতে উড়ে আসবে সময়ের কালাচাঁদ আর আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব কোনো এক ক্ষুধার আতসবাজিতে।' ভাতের সখি তার ঘামের দিকে চেয়ে বলে, 'একবার অনন্তের সন্ধান করে দেখ, চেয়ে দেখ মানবের পেট, ওই বিস্ময়কর ভূগোলের ভেতর আমরা অনন্ত মিলনের শামুক হব। এখানে বরং মিলনের পাথরগুলো এলোমেলো থাকুক।' ভাতের সখা এবার তার ঘামের কাছে নতজানু হলো আর বলে উঠল, প্রাণ এক যুদ্ধক্ষেত্র যে যুদ্ধের শেষ উত্তর নিজেকে নিজে মার। সময় এল সময় ভাঙার, ক্ষুধা বণিকের অন্তর তাদের নিল ওজনের পাল্লায়। ওজনের পাল্লায় চড়ে ভাতের সখা সখি দেখে ভোজনের তীর ছোটে ওজনের চোখে। আর অমনি ভাতের সখা ছিটকে পড়ল ওজনের প্রান্ত হতে। এবার ভাতের সখার কণ্ঠে আসে সময় ভাঙা চিৎকার, কেঁপে ওঠে পৃথিবীর সমস্ত ভাতের থালা। আর প্রকাণ্ড এক আত্মচিৎকারের ভেতর বলতে থাকে, 'মানব অন্তর আমায় ওই পাল্লার ভেতর রাখ, আমাকেও কর তোমার ওজনের ভাগিদার।' আর মানব অন্তর যখন চোখ রাখল ওজনের কাঁটায় তখন দেখল ওজনের কাঁটায় একটা চিৎকার ঝুলে আছে। ওজনের হলো দায়, কৃপা হলো ভাতের, ভাতের সখা চলে এল মানবের থলের ভেতর...

হাঁড়ির অভিজ্ঞান...

আর এভাবেই ভাতের সখা সখির চূড়ান্ত মিলন চূড়ান্ত হরিণ ঘুরপাক খেতে লাগল কোনো এক হাঁড়ির ভেতর। আগুন জলে পুড়তে পুড়তে আরো কিছু ভাতের মতো তাদের অন্তর থেকে বেরিয়ে এল জলবায়ু, মাটির আকাঙ্ক্ষা, ভালোবাসা। ভাতের সখি এবার তার সখার অন্তরে মাথার কাঁটাগুলো পুঁতে দিল। হাঁড়ি থেকে থালা, থালা থেকে কালান্তরের হাওয়া— এক মানব অন্তরে পৌঁছে যেতে তাদের থেকে গেল আরো কিছু শঙ্কা। তারা কি আর এক থালার ভাত হতে পারবে? তাইতো

হাঁড়ির ভেতর থেকে উঁকি মেরে দেখে, হাঁড়ি ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য থালার হা-হুতাশ। তাইতো ভাত দুটি এক থালার আকাঙ্ক্ষায় ছটফট করে আর তাদের ঘামের ভেতর জেগে ওঠে আরো কিছু কৌশল। ক্ষুধা ঘরের থালাগুলো যখন হা করে ছিল তখন ভাতের সখা সখি তাদের অসংখ্য মুখের কল্যাণে গেয়েছিল ভেদ বিভেদের গান। থালার অন্তর বুঝেছিল সে আকুতি। তাইতো একটা ভাঙা থালার ওপর ভাতের সখা সখি ঠোঁটে রেখেছিল ঠোঁট...

ক্ষুধার যজ্ঞ...

ক্ষুধার তাড়নায় মানবের হাত যখন ভাতগুলোকে নেড়েচেড়ে প্রস্তুত করছিল তখন ভাতগুলো কালান্তরের হাওয়ায় খুলে দিয়েছিল দেহের পেখম। আর থালার গোলার্ধে জেগেছিল ভাত পেখমের মানচিত্র, যে মানচিত্রে প্রকৃতপক্ষে কোনো রেখা নেই। তাইতো ভাতের সখা ভাতের সখি মানবের পেটের দিকে চেয়ে চেয়ে প্রস্তুত করে তাদের অনন্ত যাপনের বাঁশখুঁটি।

প্রতিটি গ্রাসের কল্যাণে কত ভাতই তো মানব অন্তরে চলে গেল, বাকি রইল মানবের শেষ গ্রাসের পরিহাস। আর এই শেষ গ্রাসের মুঠোর ভেতর ভাত দুটি খেলেছিল আরো একবার চোখ বদলের খেলা। তারপর কালান্তরের হাওয়া এসে লাগল মানবের মুঠোর ভেতর আর কীভাবে যেন শেষ গ্রাস থেকে ছিটকে পড়ল ভাতের সখা। ভাতের সখি চলে গেল মানবের পেটের ভেতর। 'মানব অন্তর অনুভব কর মুখের ভেতর প্রতিটি ভাতের স্বাদ-সুয়াদের কথা। আর কোনো এক মর্মে অনুভব কর সেসব ভাতের আত্মাহুতির রেখাগুলো, যে রেখার ভেতর জেগে আছে তোমার আয়ুর গতি।' ভাঙা থালার নিচে পড়ে রইল ভাতের সখা অথচ শেষ হয়ে গেল মানবের ক্ষুধার যজ্ঞ। আর এমনি এক বেদনার হাওয়া এসে লাগল ক্ষুধার যজ্ঞে, যার সবটুকুই ছিল ওই ভাত সখির অনাগত নিশ্বাস। আর সেই অনাগত নিশ্বাসের কথা ভেবে ভাতের সখা মানব অন্তরের কাছে মেতে গেল অন্তর ফাটা আহাজারিতে— 'দাও দাও তোমার পেটের ভেতর আমাকে পাঠিয়ে দাও। তোমার অনাগত নিশ্বাসের কথা ভেবে আমাকে কৃপা কর। আর চেয়ে দেখ আমার কপালে ফুটে থাকা লক্ষ্মী তিলকের ফুল, যার গন্ধের কাছে তোমার প্রাণের গন্ধ করে গেছে কত তামাশা। তবে কি মানব অন্তরের সাথে ভাতের অন্তরের থেকে গেল কোনো দ্বন্দ্ব? মানব অন্তর

এবার ক্ষুধার যজ্ঞ ত্যাগ করিল আর নিরন্তর আহাজারি করতে থাকা ভাতের সখার গায়ে এসে পড়ল সূর্যের তাপ। আর সেই তাপে পুড়ে পুড়ে অমীমাংসিত ভূখণ্ডের মতো ভাতের সখা হয়ে গেল আয়ুহীন...

সূচি

সূর্যের দিকে বেঁকে যাওয়া ঘোড়াগুলো কোনোদিন ভাত খেয়ে দেখেনি ১৫
ভাতের মাথায় ঢুকে গেল দস্যু ভাতেরা, আর সেসব ভাতেরা কেঁদে কেঁদে ১৬
যে ভাতগুলো জীবাণুকে ভালোবেসে দেহের ভেতর ডেকে আনল সর্বনাশ ১৭
তারপর ভাতগুলো বলল, আমরা ভূখণ্ডের পাহারাদার ১৮
এবং ওইসব ভাতের মুখোমুখি হওয়া গেল, যারা পূর্ব জনমে ছিল ১৯
মানুষ সম্পর্কে কি তোমাদের কিছুই বলার নেই? দেখুন আমরা হারানো ২০
অন্তরভাঙা ভাতটি বলল, অন্তরের অবুঝ পেন্সিলগুলো দেখে তুমি কি ২১
তবে কি আত্মার ভেতর আমাদের নাচের গল্পটা বলব ২২
ভাতগুলো আজো ভুলতে পারে না তারা মশা ছিল, মাছি ছিল ২৩
জীবিতদের টিফিনবক্সের ভাতগুলো হঠাৎ বলে উঠল ২৪
আমার নাম ভাত, আমার ধর্ম আত্মাহুতি। ক্ষুধার কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ২৫
অচেনা ভাতগুলো ছত্রিশক্ষুধা ভেদ করে নেমে এল নগরীর নিশুতি ২৬
এই বুকে যত ভাতের স্বরবর্ণ তারই আগুন জেগে থাকে দেবতাদের ২৭
এই তো আগুন দিয়ে আমার চুমুগুলো পুড়িয়ে ফেলছি ২৮
যুদ্ধের দিকে পা করে শুয়ে আছে যে মেরুদণ্ড তার নাম কি জানো ২৯
তোমাকেই বলছি ও অপমানিত পাথর, এই অন্তর থেকে অর্ধপোড়া চাকু ৩০
ঘড়ির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ভাতগুলো চলে এসেছিল মরা মানুষের ৩১
আত্মসন্ধানের বহুগামী পথে অন্ধভাতেরা এবার দেখতে পেল ৩২
আমাদের দেহ খনন করে ভাত ছাড়া আর কোনো সত্য পাওয়া যায় না ৩৩
এমন করুণা জেগে থাকে আমাদের জীবনে যার ভেতর ওড়ে শুধু ভাতের ৩৪
ভোজনসভায় মৃত্যুগামী ভাতটি যখন কথা বলছিল তখন সবকিছু গর্ভবতী ৩৫
পাগলা গারদের ভাতগুলো কত রকমের চালাকি জানে, গান গায়, নাচে ৩৬
বর্জ্যখানায় ছুড়ে ফেলা ভাতগুলো পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে এক পলক ৩৭
তোমরা ভালো করেই জানো আমরা ভাতের জাত, আমাদের হাত নেই ৩৮
এসো এসো সমবেত হও আমাদের যাঁতাকলে যেতে হবে ৩৯

আমরা সেই সৌভাগ্য ভাতজাতি যারা আগুন পানি একসাথে খাই ৪০
অনাদিকালের রক্তপিঠে ওই উড়ে যায় ভাতের কবুতর ৪১
কোনো এক ভাত তাদের প্রার্থনাসভায় বলেছিল ৪২
এ দেহের কক্ষপথ ভরে গেছে ভাতের দেনায়, কেউ কি তা জানে ৪৩
অনেক রসিকতার ছলে জলসাঘরে ঢুকে গিয়েছিল ভাত ৪৪
থালার ওপর ভাতগুলো কত কিসের কীর্তি জানে ৪৫
যতই ঘোরাই এ দেহের ভূগোল তার সবখানে ভাতের ভরাডুবি ৪৬
প্রিয় ভাত, এই যে তুমি শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে আছ আমার থালার ওপর ৪৭
প্রকৃত অন্ধকার ভেঙে গেলে ভাতগুলো ক্রীতদাস হয়ে ওঠে... ৪৮
ভাতের চোখ ফোটা নিয়ে বেড়ে গেল বিরোধ ৪৯
ভাতের মা কাঁদতে জানে না এই মর্মে পৃথিবীতে যত বাঁশি বেজেছিল ৫০
এইমাত্র ভাতের ইন্দ্রজাল খুলে দেখলাম সেখানে কোনো মহাকাল ৫১
ভাতের সখির চুল বেঁধে দিয়েছিলাম আমি। আর চুল বাঁধতে বাঁধতে ৫২
কোনো এক চক্র থেকে ছিটকে পড়া ভাতের সর্বনাশ ধীরে ধীরে বড় হয় ৫৩
তখন আর কত হবে? ধরুন পৃথিবীর ভোররাতে চরিতেছে যজ্ঞের ৫৪
মদ্যখানার দবির সরকার কোনো এক মৃত্যুর মানিক। মদ তো ভাতের মমি রস ৫৫
সাধুর হাটে সর্বনাশ হয়েছে ভাতের বোষ্টুমি ভুলে গেছে সব গান ৫৬
জীবন প্রশ্নের মুখে ফুটল কত গন্ধমের ফুল। আর ভাতের গায়ে ৫৭
মেঘের অন্তরে এত ভাত জমে আছে দেখি না তো কোনোদিন ৫৮
আজ মৃত্যুবার। আজ কাঙালের আকাশে নেমে আসবে নিরন্তর ভাত ৫৯
এই যে কানার হাটে জ্বলছে বাতি এ আলো ভাতের সদিচ্ছা ৬০
আজ একটা সমাবেশ আছে, প্রাচ্যের সকল ভাতের থালার সমাবেশ ৬১
পৃথিবীর আলো অন্ধকার খুঁজে খুঁজে অবশেষে একটা ভুল জনগোষ্ঠীর ৬২
কারা যেন ভাত ভাত করে নিজের ক্ষুধা বন্ধক রেখেছিল তালপাতার ৬৩
ভাতের শেষ বচনের কথা আটকে গেল শেষ নিশ্বাসের সরু গলিতে ৬৪

ভাতের ভূগোল

এক

সূর্যের দিকে বেঁকে যাওয়া ঘোড়াগুলো কোনোদিন ভাত খেয়ে দেখেনি। পৃথিবীতে রাত লেগে যাওয়ার আগে ভাতগুলো আয়না দেখেছিল আর সেই আয়নার ভেতর ভেসে উঠেছিল ফাঁসিগামী আত্মার পূর্বক্ষণ। আর এভাবেই যে সকল ভাতেরা আয়নাতে রেখেছিল মুখ তারা মুখের বদলে দেখেছিল মানচিত্র। তবে কি ভাতের আয়নার ভেতর জেগেছিল জ্বর? তাইতো সিন্ধু থালার দিকে হাঁটতে থাকা প্রতিটি ভাতের গা গরম। কোনো কোনো ভাত একেবারেই অন্ধ, যে ভাতগুলো পাখির ঘরে গিয়ে আর ফেরেনি তারা ছিল আগুনের সৎভাই। তাইতো জনম কানার দেয়ালে ঝুলে থাকে ভাতের আয়না। আর সে আয়নার একি রসিকতা! ভাতের মুখের বদলে তুলে ধরে পৃথিবীর মানচিত্র...

এবার বলুন ভাতযজ্ঞের বিজ্ঞ পুরোহিত, ভাতের শেষ প্রার্থনায় বেজে ওঠা ঘোড়ার হাসি কোন মন্দিরের কাঁটায় ঝুলে আছে? এই যে ধরুন, আমরা সমস্ত মৃত ঘোড়ার হাসি ধরে এনেছি, আর সেসব ভাতেরা যারা ছিল প্রকৃতপক্ষে পিতা মাতাহীন তারাও দুর্ভাগ্যের যজ্ঞ থেকে পালিয়ে এসেছে। আর সেসব ভাতেরা যারা ছিল মানচিত্রের সৌভাগ্য তারা চলে গেছে বেড়ালের পেটে। তবে কি হতভাগ্য ভাতগুলো ভুলে গিয়েছিল তাদের মুখ দেখার বাসনার কথা? ক্ষুধার শব্দে ফেটে গেছে ভাতের আয়না, ফেটে গেছে সকল ভাতের মাথা, আর পৃথিবীর গতি চুরি করে নিয়ে গেছে গর্ভবতী বেড়ালেরা... তবে কি বেড়ালের গর্ভপাতের দিন ভাতের আয়নার কোনো কল্যাণ লুকিয়ে আছে? তবে কি পৃথিবীর মানচিত্রগুলো সকল ভাতের মুখের রেখা? তাইতো উড়ন্ত মাছিগুলো যখন ভাতের কাছে এসে চুমু খায়, ভাতগুলো তখন উড়ন্ত মাছির দিকে বেঁকে যায়, আর অস্থির মাছির সাথে উড়তে উড়তে বলে, তুমিই বল কোন গতি সত্যের দিকে, পৃথিবীর? নাকি থালার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা ভাতের...

দুই

ভাতের মাথায় ঢুকে গেল দস্যু ভাতেরা, আর সেসব ভাতেরা কেঁদে কেঁদে হলো বিরান, যারা ভোরের অন্ধকারকে মা বলে ডাকত। আর সেই মা বলা অন্ধকার একদিন খুন হয়ে গেল দস্যু ভাতেরই হাতে। তবে কি ভাতের হাতেই ছিল মাতৃহননের প্রকৃত কৌশল? ভাতের মা হেসে হেসে আটখান। তবে কি ভাতের মা জেনে গিয়েছিল মাতৃহত্যায় লুকিয়ে আছে ভাতগুলোর জন্মমঙ্গল? তাইতো ভাতগুলো থালার ওপর অধিকতর বিমর্ষ হয়ে ওঠে, বিমর্ষ হয়ে ওঠে ক্ষুধার হাড়হাড্ডি। তাইতো কোনো এক দুর্ভাগ্যের দিকে চলে যাওয়া ভাতগুলোকে কেবল কাঁদতে দেখা গিয়েছিল। এমন ভাতের কান্নার সাথে পৃথিবীর কোনো কান্নার মিল আছে কি? এই ভাবনায় থালার ওপর ভাতগুলো হাঁটুমুড়ে বসে। আর ওই যে ওই ভাতগুলো যারা ক্ষুধার গভীর থেকে পালাতে গিয়ে ঝুলে গেছে থালার কার্নিশে, সেসব ভাতের ভেতর শুয়ে আছে মরাবাড়ির বনবেড়াল। মরাবাড়ির হাঁড়িগুলো কত কিসের জাদু জানে, সকল কান্না শেষ হলে তবেই ভাতগুলো হাসে। সেসব হাসি তখন মরাগাছের চোখ ফোটায়, মরাগাছের চোখ ফুটলে ভাতের মায়ের হাতে আসে স্বর্গের চাবি। আর দস্যু ভাতগুলো মরাবাড়ির হাঁড়ির ভেতর দেখতে পায় তাদের জন্মের খাতা। তবে কি দস্যু ভাতগুলোই ছিল মরাবাড়ির খাবার? ভাতগুলো সহজেই বুঝেছিল মরাবাড়ির ক্ষুধার মর্ম, যে মর্মে কোনোদিন কোনো ফুল ফোটে না, কোনো চাঁদ ওঠে না, সে মর্ম কেবল ভাতের কপালে লেগে থাকা বনবেড়ালের আঁচড়ের মতো...

তিন

যে ভাতগুলো জীবাণুকে ভালোবেসে দেহের ভেতর ডেকে আনল সর্বনাশ, কেবল তারাই জেনেছিল হাওয়া আর পানির প্রকৃত প্ররোচনা। আর ক্ষুধার্ত পাড়ায় তেঁতুল গাছের একি অশনিসংকেত! তারাও নাকি ভাত গ্রহণের স্বপ্ন দেখে চন্দ্রগ্রহণের রাতে। বৃক্ষ খাবে ভাত! ভাত খাবে বৃক্ষের ছায়া! এমন শঙ্কায় ভাতে ভাতে বেড়ে গেল কলহ। কোনো কোনো ভাত বমি হলো দুর্গম পথে, কোনো কোনো ভাত পচনে পচনে মরে গেল কত কার ঘরে। তাইতো ক্ষুধার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল ভাত মহলের কেউ কেউ। আর এই মর্মে যখন ভাতগুলোকে ডেকে আনা হলো বন্দিশালার ক্ষুধার কাছে, তখন ভাতগুলো বুঝেছিল পাখি আর সূর্যের পাপ পুণ্যের কথা। আর পাখির পাপ খেয়েছিল যে ভাতগুলো কেবল তারাই জেনেছিল বন্দিশালার ক্ষুধার্ত মুখগুলো অর্ধেক পৃথিবী খেয়ে ফেলেছে। আর যে ভাতগুলো সূর্যের পাপ গায়ে মেখে অবিরত ঘুরছে পৃথিবীর মাথার ভেতর, তারা বলে কিনা ক্ষুধার ওজনের সাথে ভাতের ওজনের কোনো মিল নেই...

তাইতো বন্দিশালার ভাতগুলো অপরাধকে ভালোবেসে হয়ে গেল জগৎ মাতাল। আর কিছু কিছু ভাত বন্দিশালার ঘর থেকে প্রেমময় পাপগুলো গলায় বেঁধে নিল। আর অপরাধকে মাথায় তুলে ভাতগুলো এমনি এক আহ্লাদে মেতে উঠল, যেন একটি ভাত আরেকটি ভাতের কাছে গিয়ে বলে, বল তোমার অপরাধ দেখতে কেমন? সেই ভাতের সহসা উত্তর— জ্যোৎস্নার মতো। তবে কি জ্যোৎস্না একটা অপরাধ? কিছু কিছু ভাত গারদের তালার ভেতর ঢুকে গিয়ে বলে উঠল, এসো আমরা চাবি হই। আর লোহার দেয়ালগুলো হেসে উঠে বলেছিল, আমরাও পাপ জানি। এই যে আমাদের গায়ে বেড়ে ওঠা মরিচাটুকু দেখছ, এটুকু সুস্বাদু অপরাধ। আর যেসব ভাতেরা যারা বন্দিশালার ঘর থেকে অপরাধগুলো কেনাবেচা করত তারা বন্দি ভাবনায় হয়েছিল ব্যাকুল— বন্দিদের পেটের ভেতর তারাও কি অপরাধ হয়ে যাবে? তাইতো কারাগারের অপরাধগুলো তেঁতুল গাছের মতো, ক্ষুধার্ত জিরাফের মতো, ভাতের সাথে খেলা করে। তাইতো কারাগারের ফাঁকা ঘরটিতে আজীবন শুয়ে আছে পৃথিবীর প্রথম ও শেষ অন্ধকার।

চার

তারপর ভাতগুলো বলল, আমরা ভূখণ্ডের পাহারাদার। তারপর ভাতগুলো সেই দরজায় কড়া নাড়ল। দরজার কাঠগুলো বলল, আমরা ভূখণ্ড চিনি না। এবং ভাতগুলো বলল, সূর্য অনেক চাতুরি জানে। এবার দরজার ভেতর থেকে পাঙ্খি দিদি বলে উঠল, প্রার্থনার শেষ অঙ্ক ভুল হয়েছে, সূর্যের দিকে বেঁকে গেছে দেহ, প্রাণের কাছে এসেছে ভাত। আর এভাবেই দরজার কাঠগুলো ভাতগুলোকে বলেছিল, তোমরা কি কখনো প্রার্থনাশালায় গিয়েছিলে? আমরা প্রার্থনার পাহারাদার। আর এভাবেই ভাতগুলো কাঠগুলোকে উপহাস করেছিল, প্রার্থনাশালার সকল কয়েদির নাম ভিখেরি। তবে কি পাঙ্খি দিদির জন্য অপেক্ষাকারী ভাতগুলো ছিল প্রকৃত প্রার্থনাকারী? এবার পাঙ্খি দিদি যখন তার প্রার্থনাশালা থেকে বেরিয়ে এল তখন ভাতগুলো শুঁয়োপোকারূপে, বেড়াল পায়ে কিংবা ইঁদুরছানার মতো তার প্রাণের ওপর হাঁটতে লাগল। দিদি এবার হেঁটে হেঁটে ভাতগুলোকে নিয়ে এল নিজ ঘরে। দিদির ঘরে পৃথিবী ছিল শূন্য থালার মতো। এবার ভাতগুলো থালার ওপর শুয়ে গেল, এবার দিদির ক্ষুধার ভেতর অনাদি কালের ভাতগুলো পিঁপড়া হলো। ভাতের পিঁপড়াগুলো যতবার ক্ষুধার ভেতর চিমটি কাটে, ততবার পাঙ্খি দিদি ভাতের ওপর চুমু কাটে, ভাতের থালার রূপ ধরে পৃথিবী তখন ভেড়ার লোমের মতো কেঁপে ওঠে, পাঙ্খি দিদির প্রাণে আসে দায়। কতকাল খেয়েছি ভাত! ভাতের ভারে কতকাল জীবনের পাহাড় ধসে ধসে পড়ে। তাইতো পাঙ্খি দিদি প্রাণ থেকে উপড়ে ফেলে খাদ্যনালীর সুতা, সেই সুতায় ভাতফুল দিয়ে মালা গাঁথে, সেই মালা কোমরে বেঁধে অবিরত নাচতে থাকে জীবনের সভায়...

পাঁচ

এবং ওইসব ভাতের মুখোমুখি হওয়া গেল, যারা পূর্বজনমে ছিল মৌমাছি। আর মৌমাছি ভাতের সাথে মহাকালের ছিল এমনই এক ভাব যেন মহাকালের কোনো এক ডালের ওপর জমে উঠল ভাতের মৌচাক। আর মৌমাছি ভাতেরা পৃথিবীর সকল ক্ষুধা হতে মধু এনে জমা রাখল মহাকালের ভেতর। তবে কি মৌমাছি ভাতগুলোই ছিল পৃথিবী ও ক্ষুধার প্রকৃত রহস্য? কারণ কোনো এক জনমে ভাতগুলো ক্ষুধা খেয়ে বাঁচত, কারণ এ জনমে ক্ষুধাগুলো ভাত খেয়ে বাঁচে? আরো একটা ব্যাপার— যে ভাতটি উড়ত, সে ভাতের শরীর ভরে ছিল কেবলই পাখা আর যে ভাতটি দেখত, সে ভাতের পুরো দেহটায় ছিল চোখ, কিংবা মুখওয়ালা ভাতগুলো দেহভরা মুখের কল্যাণে ভেবেছিল কীভাবে মৃত্যুগুলো খেয়ে ফেলা যায়। তাইতো একদিন ভাতের চাক ভেঙে গিয়েছিল আর ভাতের চাক ভেঙে যতসব ক্ষুধাবৃক্ষের মধু— সবই খেয়েছিল মহাকালের মুখ। মৃত্যু করেছিল পাপ, তাইতো ভীষণ এক অভিশাপে ভাতগুলো ডানা ভেঙে পড়েছিল পৃথিবীর থালায় থালায়...

এবং এভাবেই ভাতের ওপর এসেছিল পরজনমের ভার। এবং ত্রিকাল এসে কখন যেন এককাল হয়েছিল ভাতের গায়ের ওপর। তাইতো জনম জনম ভাতের গায়ে ফুটে আছে নিমগাছের আকাঙ্ক্ষা। আর এভাবেই সব ভুলে গিয়ে বিস্মৃত ভাতেরা একটু একটু মনে করতে পারে ধোপার ঘরে ঢুকতে গিয়ে কীভাবে তাদের নাক মুখ ভেঙে গিয়েছিল। আর নাক মুখ ভাঙা ভাতগুলোকে দেখা গিয়েছিল ক্ষুধার্ত হাতের ফাঁকে লুকিয়ে যেতে। আর ক্ষুধার্ত মুখ যখন ওই ভাতগুলোকে ধারাল জিভ দিয়ে টেনে ধরল তখন ভাতগুলো এমন এক চিৎকার করল, যেন সেই চিৎকার গিয়ে বাধা খেল মহাকালের গায়ে, তারপর ভাতের চিৎকারগুলো মেঘ হলো, আর সেই মেঘগুলো ভাতের আর্তনাদ নিয়ে ছুটে গেল খরা অঞ্চলের দিকে...

ছয়

মানুষ সম্পর্কে কি তোমাদের কিছুই বলার নেই? দেখুন আমরা হারানো ব্যাপারটাই বুঝি না। আমাদের ঘাড়ের ওপর বাঁধা আছে দুটো বিপদগামী ঘোড়ার পথ প্রান্তর, আমরা ভাদ্র মাসের ভাত। আচ্ছা তোমরা কি কখনো স্বপ্ন দেখেছিলে? কত আর বলব বাঘের অন্তরে জন্মেছে সোনার দূর্বা। তোমরা কি শোনোনি এই নগরে পাগলের গলায় পিঁপড়া লেগেছে? শুনেছি পাগলের চিৎকার দিয়ে নতুন একটা আজান হবে। তাইতো আমরা মৃত বেড়ালের ঘুম থেকে তুলে আনি কাঁচা কাঁচা ফুল। তবে কি ঘোড়ার ঘুমের ভেতর তোমরাই খালি পায়ে নেচেছিলে? নাহ! আমরা মাটির ভেতর যা যা শিখেছিলাম মাটির ওপরে এসে সবই গিয়েছি ভুলে। ভাতের কোনো মন নেই, ভাতের কোনো আকার নেই, ক্ষুধাই ভাতের মন, পৃথিবীই ভাতের আকার। আর প্রশ্ন কর না মানব অন্তর, এবার তোমার থালার ওপর একবার ঘুমোতে দাও, আমাদের ঘুম তোমাদের থালার জাগরণ। তবে কি ভাতের যুবতি কেটেছে মানচিত্রের ঘুম? দাঁড়াও ভাদ্রের ভাত, ঘুমানোর আগে বলে যাও ক্ষুধা দেখতে কেমন?

আবার সাঁতারের কথা মনে করিয়ে দিলি মানব অন্তর! বৃহস্পতি আর শনির ভেতর আমরা কতকাল ব্যাঙরূপে বেঁচে ছিলাম। তারপর মৃতদের আকর্ষণে মঙ্গলে হয়েছি আকন্দের পাতা। আমরা কখনোই জানতাম না সূর্যের ঘুম আছে, তারপর সূর্যের স্বপ্নের ভেতর লাল ফড়িং হয়ে উড়েছি সহস্রকাল। আমরা কখনোই জানতাম না মাটির রক্ত আছে, তাইতো সেই রক্তের আকর্ষণে নেমে এসেছি মাটির জঠরে। অবশেষে সেই মাটির কাদাজলে হয়েছি সুবর্ণ ডিম। আর মাটির ভেতর থেকে থেকে শুনেছি শাদা শাদা কান্নার শব্দ, সেই শব্দের আকাঙ্ক্ষার কাছে আমরা ভেঙে গিয়েছি। আর ভেবেছি নিশ্চয় মাটির উপরিতলে কোথাও পাখি আর শিশু আছে যারা কোনো এক জীবনে আমাদেরই আত্মার স্বরূপ। তবে কি সুবর্ণ ডিম ভাঙার প্রকৃত রহস্য শিশুদের কান্না? এই তো আমি ভাতের গা ছুঁয়ে বসে আছি, ভাতগুলোর চোখ বুজে আসছে, ভাতগুলো এবার কোন দিকে যাবে? কোন আকার নেবে মানব অন্তরে? অমনি ভাদ্র মাসের কোনো এক

ভাত যেন বলে উঠল, আমি তোমার ছবি হব, তোমার ভেতরের ভেতর আজান দেব...

সাত

অন্তরভাঙা ভাতটি বলল, অন্তরের অবুঝ পেন্সিলগুলো দেখে তুমি কি করে বুঝবে পৃথিবীর ছেলেবেলা? বরং অনুভব কর মরাকাটা অন্ধকার, গলাকাটা ভাতের কাছে কীভাবে আলো খোঁজে। এবার মাথাভাঙা ভাতটি বলে উঠল, আমরা আর কোনো আলোর নাম দিতে পারি না, ভূখণ্ডের স্বভাব দ্বিখণ্ডিত হওয়া, ভাতের ভাগ্যে কোনো রক্ত নেই, তবুও ভাতের রক্ত থেকে পাখির কাজল বেরিয়ে আসে। এবার জনম বাঁকা ভাতটি বলল, কেউ কি জানে মাটির মা দেখতে কেমন? কোনো কোনো ভাত বলে উঠল, শূন্যে ভাসমান মাটির ডানাগুলি মানচিত্রের মতো নয়।

উঠোনের ওপর শুয়ে শুয়ে ভাতগুলো এভাবেই ভুল বকছিল। আর বায়ুশঙ্খ পাখিরা যারা কিনা ভুল কথা ছাড়া আর কোনো কথা শোনে না তারা হঠাৎ উড়ে এসেছিল ভুল বকা ভাতগুলোর কাছে। আর ভাতগুলো শুয়ে শুয়ে দেখতে পেয়েছিল পাখির রূপ ধরে পৃথিবীর ক্ষুধা কীভাবে ভাতের দিকে উড়ে আসে। পাখিগুলো এবার ভাতের মাথার ওপর ছেড়ে দিল ভুল ডানার ছায়া। আর ভাতগুলো অনুভব করল পাখি হবার পেছনে আলোকিত শস্যের কোনো দায় নেই।

অবশেষে বায়ুশঙ্খ পাখিরা বর্গাচাষির উঠোন থেকে কিছু নিরীহ ভাতকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। আর বায়ুশঙ্খ পাখির থলির ভেতর ওইসব ভাতই ছিল পৃথিবীর উপকথা। এবং পাখিগুলো যখন তাদের থলির ভাতগুলোকে শাবক পাখির থলির ভেতর স্থানান্তর করছিল তখন একটি ভাত আরেকটি ভাতকে বলছিল, দেখ মহাশূন্যের কাছে আমরা কত অমীমাংসিত? ভাতের এমন কথায় পাখিগুলো এবার অস্থির হয়ে উঠল, কারণ পাখিরা জানত আলোই সর্বময়। পাখির এমন কথায় ভাতগুলো এবার বিমর্ষ হয়ে উঠল, কারণ তারা বুঝেছিল চিতাকাঠের আগুনে কোনো তাপ থাকে না। পাখিগুলো এবার ভাতগুলোকে বলল, তোমাদের চোখে এত রক্ত কেন? তোমরা কি কখনো আলো দেখেছিলে? ভাতগুলো এবার জ্ঞানশূন্য হলো আর বলে উঠল, সেসব ভাতচাষি যারা কিনা আমাদের দাইমা ছিল, তাদের ঘামগুলোকে জোনাকি হতে দেখেছি। পাখিগুলো এবার ভাতগুলোকে তাদের কণ্ঠনালীতে বাঁধল আর অমনি পাখির ক্ষুধাগুলো ভাতের

ভেতর হয়ে গেল জোনাকি। তাইতো বায়ুশঙ্খ পাখিরা জগৎ ভাবনায় মরে, তবে কি কালের অন্ধকারে ভাতগুলো জোনাকি ছিল? পৃথিবীর অন্ধকার একি বিভ্রম পাঠশালা, মানব অন্তর যাকে দেখে ভাত পাখির অন্তর তাকে দেখে জোনাকি...

আট

তবে কি আত্মার ভেতর আমাদের নাচের গল্পটা বলব? না না, মৃত মানুষগুলো যেসব ভাতের ছবি তুলেছিল সে গল্পটাই বল। তোমরা থাম তো, তামা হাঁড়ির ভেতর কোনো গল্পই শুভকর নয়। বরং চোখ মুখগুলো যত দ্রুত পুড়িয়ে ফেলতে পার ততই মঙ্গল। একি সর্বনাশ! তুমি কি আবারো মনে করতে চাও যে, ভাতজন্মের আগে তুমি লোহা ছিলে? সে কী কথা! তোমরা থামলে কেন? যার যা মনে পড়ে দ্রুত বলো, আমাদের দেহগুলো গলতে শুরু করেছে। এই ধর নর-নারীর ভেতর পাখির নির্মিত কারুকর্মগুলো আমাদের ভুলে যেতে হবে। এই ভাতের শাবকেরা, তোমাদের মাড় হয়ে যেতে আর কতদূর বাকি? সময় কর, জলদি সোনা আর পিতলের মর্মকথা ভুলে যাও, নয়তো আমাদের মৃত্যুর ওপর অসময়ের সাতভাই এসে পড়বে। তোমাদের কি মনে নেই অসময়ের প্রথমজন ভাতের চুল কেটেছিল? আর ওদের দ্বিতীয়জনকে কি দেখনি কীভাবে ভূতের পানপাত্রে জল হয়েছিল? আর অসময়ের তৃতীয়জন, সে তো এক জাদুকর! যে কিনা মৃতের সাথে মাটির, চাঁদের সাথে যৌবনা ভাতের বিবাদ ডেকে আনে। ভয় নেই বন্ধুরা, মানবের ঘরবাড়ি কিংবা হাঁড়ি আমরা বিশ্বাস করি না। আমাদের বিশ্বাসের ওপর ডাঙ্গুলি খেলে অসময়ের চতুর্থজন। তাইতো মানবের বিয়েবাড়ি কিংবা মরাবাড়ি সবখানেই আমাদের করুণা বিরাজ করে। আর কথা নয়, তোমরা নিজের ভেতর যাও আর দেখে এসো অসময়ের পঞ্চম ভাইটি ঘুমিয়ে পড়েছে কি না? আর ভুলে যেও না এই তামা হাঁড়িতেই পুড়ে যাওয়া শেষকথা নয়, মৃত মানুষের সপ্নের ভেতর আমাদের সাপ হতে হবে, ব্যাঙ হতে হবে। তোমরা কি এই হাঁড়ির ভেতর থেকে দেখতে পাচ্ছ মৃত মানুষের শেষ নিশ্বাস? দেখ অসময়ের ষষ্ঠ বাতাস কীভাবে উড়ে যায়। আর ভাতবন্ধুরা তোমরা যারা এই বাতাস দেখতে পেলে না তারা তোমাদের চোখগুলো উপড়ে ফেল, আর দেখে নাও পৃথিবীর থালার ওপর বসে থাকা অসময়ের সপ্তম অজগর...

নয়

ভাতগুলো আজো ভুলতে পারে না তারা মশা ছিল, মাছি ছিল, ভাতগুলো কখনো ভুলে যায় না পাহাড়ের পাদদেশে তারা কয়লারূপে বেঁচে ছিল বহুকাল। এবং এভাবেই বাঘের তলপেটে তারা ঘাম হয়েছিল, শয়তানের মৃগনাভির ওপর ঘামাচি হয়েছিল। তারপর অন্ধকারের আকাঙ্ক্ষা এসে যখন তাদের মগজ দখল করল তখন তারা হলো তেলাপোকা, মাটির অসৎ বাণী এসে যখন তাদের বিদ্বান করল তখন তারা হলো পিপীলিকা।

ভাতগুলো কিছুতেই ভুলতে পারে না কুমারীর প্রথম রক্তই ছিল তাদের প্রথম শিল্পকর্ম। তাইতো তারা কুমারীর বক্ষদেশে জমাট হলো। এবং তারা ছিল ঘূর্ণিযুদ্ধের বিজয়ী সৈনিক, তাইতো মানব অন্তরে নির্মাণ করেছে কত রকমের ভাস্কর্য। আর এভাবেই ভাতগুলো ক্রীতদাসের ঘরে ছিল গবাদি পশু, বৃক্ষ বেড়ে গেলে বেড়ে যেত ভাতের মুখের লালা, চাঁদ বেড়ে গেলে সেই লালা ছিল মরা চাঁদের রক্তস্রাব। ভাতগুলো তামাক পাতার ওপর ঘুমিয়ে ছিল বহুদিন আর তারা স্বপ্নে দেখেছিল জন্ম মৃত্যুর দূরত্ব কেবল একটি মাকড়সা। তাইতো ঘুম থেকে জেগে তারা হয়েছিল মাকড়সা, আর এভাবেই ভাতগুলো গাছের জীবনে হয়েছিল কাঠ, মাছের প্রয়োজনে হয়েছিল জল।

তারপর ভাতগুলো কিছুতেই ভোলেনি এক আত্মহত্যাকারীর চোখের দাঁতগুলো এবং ওই প্রথম ভাতগুলো ভুলে গিয়েছিল আত্মহত্যার থালার ওপর তারা কী রূপে বিরাজ করেছিল। ভাতগুলো বলেছিল 'সন্ধ্যা', আত্মহত্যাকারী বলেছিল 'ডুমুর'। ভাতগুলো এবার কিছুতেই মনে করতে পারে না ওই আত্মহত্যাকারীর শেষ ক্ষুধার রঙগুলো। তাইতো আত্মহত্যাকারীর আঙুলের ফাঁকে তারা হয়েছিল বকুল ফুল। ভাতগুলো বলল, 'তাসের অক্ষর' আত্মহত্যাকারী বলল, 'জীবনের পোকা'...

দশ

জীবিতদের টিফিনবক্সের ভাতগুলো হঠাৎ বলে উঠল, আমরা কবর দেখেছি। শস্যের ভেতর যে ভাতটি আজো জন্ম নেয়নি সে ভাতটি বলে উঠল, মৃতদের টিফিনবক্সের ভাতগুলো কেমন আছে? দুর্ভাগ্যের গোলকধাঁধায় যে ভাতটি আয়ুর কাঠি গোনে সে ভাতটি বলে উঠল, কবর দেখতে কেমন? জীবিতদের ঘুমের দৃশ্যে যে ভাতটি পাথর ছিল, মৃতদের ঘুমের দৃশ্যে যে ভাতটি ধূসর ছিল সে ভাতটি এবার বলে উঠল, মৃত মানুষের টিফিনবক্সে যে ভাতগুলো শুয়ে ছিল তারা কোনোদিন মৃত্যু দেখেনি। জীবিতদের টিফিনবক্সে যে ভাতগুলো ঝোল মেখেছিল কেবল তারাই দেখেছিল আয়ুর ডগা কীভাবে খসে পড়ে। আর এভাবেই নিদ্রাবহনকারী ভাতগুলো মানুষের কাছে এসে সন্ধান করে প্রকৃত কবরের। কেউ বলে মাথার ভেতর, কেউ বলে আয়ুর ঘরে। আর যে ভাতগুলো চিরকাল নীরব কেবল তাদের অন্তরে ফোটে তেঁতো আতাফল। তাইতো আয়ুবহনকারী ভাতগুলো দেখতে পায় মৃত মানুষের টিফিনবক্সের ভাতগুলো আর ভাত নেই, তারা জীবিত মানুষের স্বপ্ন হয়ে গেছে। শুধু কি তাই, মৃতদের আয়ুর বাক্স ভেঙে যে ভাতটি ডালিম ফুল হয়েছিল, সে ভাতটি দেখেছিল জগতের ভোজনসভায় ভাতগুলো এখন দুর্ভাগ্যের মুকুট পরে ঘোরে।

শস্যের ভেতর যে ভাতটির এখনো জন্ম হয়নি সে ভাতটি এবার ভয়ে কেঁপে উঠল। আর জীবিত ও মৃতদের স্বপ্নের ভেতর যে ভাতটি নিরন্তর চলমান, সে ভাতের কাছে জানতে চাইল, ভয় দেখতে কেমন? আর মৃতদের টিফিনবক্স ভেঙে ওই ভাতগুলোই বা কোন দিকে গেছে? স্বপ্নের দৃশ্য বহনকারী ভাতটি বলল, ওই ভাতগুলো কোন দিকে গেছে জানি না, তবে তাদের কেউ কেউ শেকড় বাকড়ের মর্ম কেটে কেটে বানিয়েছে মৃতদের মানচিত্র। কেউ কেউ হয়ে গেছে তুলসীপাতার নকশা। আর তুমি যখন জগতের ভোজনসভায় রাখবে পা, তখন দেখবে তোমার মাথায় দুর্ভাগ্যের মুকুট, ক্ষুধার্তরা যখন তোমাকে খাবে, তখন তোমারও পাবে ভীষণ ক্ষুধা, আর তুমি ঢুকে যাবে মৃতদের টিফিনবক্সে...

এগারো

আমার নাম ভাত, আমার ধর্ম আত্মাহুতি। ক্ষুধার কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আমার চোখের সামনে যা ভেসে ওঠে তা হলো বরফের রক্ত। অথচ পৃথিবীর বিরুদ্ধে তোমরা আমাকে ডেকে আনলে একমাত্র সাক্ষ্যদাতা। এই যে হঠাৎ জ্বলে ওঠা আলোটুকু দেখছ, এটুকু হত্যাপ্রবণ মাটির পাঁজর ধসে পড়া, আর এই যে আমাদের চোখ, এটা ভেঙে পড়া কোনো দৃশ্যের স্থির ঘোড়া। পাঁজর ভাঙা মাটির ফোকরে আমরা তাকিয়ে আছি পলকহীন, বরং পলক পড়লেই আমাদের চোখ থেকে ধসে যাবে ক্ষুধার কাজল। যদি আরো অন্ধকার হও তবে নিশ্চয় দেখতে পাবে বৃদ্ধ মাটিরা কীভাবে শস্যগুলোর নাম রাখছে। ওই যে শাদা শাদা শস্যগুলো শিশুদের মতো দৌড়ে যাচ্ছে সুবর্ণ থালার দিকে, জেনে রাখ ওদের পায়ে ও পিঠের উদ্ভ্রান্ত বেদনার কাঁটাগুলো খুলে রাখা হয়েছে। কিংবা দেখনি কি তোমার তলপেটের ছোরাগুলো সময়ের উল্টো পিঠে কীভাবে হেসে উঠত? ঠিক সেভাবেই ভাতের বালিকাকে দেখে নাও ক্ষুধার দিকে যেতে যেতে কীভাবে গাইছে মাটির মর্মগান। জানি তোমাদের অসময় পাড়ায় এ আমার বিদ্যুৎভঙ্গি, তবু চিনে রাখ কাজলপরা ভাতগুলো ক্ষুধার নামতা পড়তে পড়তে কীভাবে ক্ষুধার থালায় উপুড় হয়ে গেছে। আর যারা মানচিত্রের রেখাগুলো ছেড়ে দিয়েছিল কেউটে সাপের মতো, আর যারা প্রাণের রেখাগুলো টেনে ধরেছিল সর্বনাশের দিকে... জেনে রাখ, মৃত্যুর ভেতর দেখেছি পৃথিবী এক নিরন্তর অবান্তর উপত্যকা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, পৃথিবীর তলপেটে মৃত্যুর গাছ আর সম্ভবত জোয়ান ভাতগুলো আটকা পড়েছে তোমাদেরই বিষুব রেখার তারে। ওহ! প্রাণবাদী অক্ষর মৃত্যুকে বাজি ধরে দেখ, দেখবে তোমাদের থালার চারিদিকে ভাতগুলো কীভাবে জন্মান্তর নিয়েছে কাঁধে...

বারো

অচেনা ভাতগুলো ছত্রিশক্ষুধা ভেদ করে নেমে এল নগরীর নিশুতি রাতে। ভাতগুলো বলল, কবে আর হবে মানব অন্তর চুরি? তাইতো সিঁদকাঠি হাতে করে চলে এল নগরীরর মৃত আয়ুর ওপর। মৃত আয়ু ছিল ভাতের সৎভাই, ভাতগুলো বেদ শাস্ত্রের সমস্ত পৃষ্ঠা ছিঁড়ে ছিঁড়ে তাদের পোশাক বানাল। আর দেখল নিশুতি রাতের রক্তের ভেতর এক পাহারাদার থেকে থেকে চিৎকার করে। ভাতগুলো বলল, আমরা ক্ষুধার শিলাবৃষ্টি। পাহারাদার ভাবল নিশ্চয় নগরীতে নেমে আসা এ এক অচেনা দস্যুর ভাব। আর এভাবেই ভাতগুলো নগরীর সমস্ত ঘুমের গোপন রস মেখে দুগ্ধ হলো, আর বলতে লাগল...

এই যে পাহারাদার, তুমিই তবে নিয়েছ নিশুতি রাতের ভার? আর মাঝে মাঝে উড়ে আসা আলো দেখে কণ্ঠ থেকে ছিঁড়ে ফেল এক আশ্চর্য হাঁক। কেমন করে তোমার আহামরি চিৎকার মিশে যাচ্ছে দেয়ালে দেয়ালে? আর নিমিষেই দেয়ালের গা থেকে ফুটে উঠছে পাথর পাথর গোলাপ। যে গোলাপ দেখে নিশুতি রাতের পথচারীরা ভয় পেয়েছিল। কী এমন মর্ম বেজে উঠলে আমাদের ভয়গুলো পাখি হবে আর তোমার প্রাণের ওপর বড় হবে গোলাপের চারা। এই দেখ, আমাদের হাত নেই, পা নেই, আমাদের পিঠের পৃষ্ঠাগুলো বড়ই এলোমেলো। আমরা ভাত, আমরা খুঁজছি পৃথিবীকে; আমাদের চাঁদ চুরি হয়েছে, আমাদের মাটি চুরি হয়েছে, চুরি হয়েছে আমাদের ভূগোলের অন্ধকার। আমরা যথেষ্ট বায়বীয়, তোমার চোখ এড়ানোর কোনো যুক্তি আমাদের নেই, এই যে আমাদের মাথার ওপর আমাদেরই সতীর্থদের কাটা মুণ্ড, হাত বাড়ালেই তুলে দিতে পারি ক্ষুধার্তদের দেনা পাওনা।

এই তো মনে চলে এল কিছু পাথরের কথা, যে পাথরের মুখে অবিরত পড়ছে পৃথিবীর ফুলচন্দন। আমরা কিছুতেই বুঝতে পারি না তোমরা এত পৃথিবী পৃথিবী কর কেন? এই তো আমাদের বিগত দিনের হাতে সুষম দিনের অন্ধকার, অনাগত দিনের হাতে বিগত দিনের মাটি। এসবের সাথে পৃথিবীর কি কোনো যোগসাধন আছে? অথচ তোমার হাড়ভাঙা হাঁকগুলো পৃথিবীর সাথে গোপনে খেলছে খেলা। আমরা কি

সহসাই নিশুতি রাতের পথে বাজিয়েছি অস্তিত্বের ঢোল। তোমরা জানো না, কতকাল হারিয়ে গেছে তোমাদের ভাতের আদি পাথর।

তেরো

এই বুকে যত ভাতের স্বরবর্ণ তারই আগুন জেগে থাকে দেবতাদের জুতার ভেতর। কোনো এক জুতার ফিতায় লটকে পড়া আমাদের পৃথিবী এই রাত্রির কাছে এসে নতজানু হয়। ভাত তো প্রাণের ব্যঞ্জনবর্ণ। তাইতো ভাতের গায়ে হঠাৎ জেগে ওঠা জগৎ পাথর, আমরা বুঝে উঠতে না উঠতেই পাঁজরের কাছে এসে জমা হতে থাকে আগুনের কামরাঙা। এই তো তোমাদের জুতার অহংকারের কাছে হেরে গেল আমাদের ঘড়ির কাঁটা। একদিন এ জীবনের সকল আগুন জমা দিয়েছিনু যার মগজের ভেতর, সেই ভাত কিনা পৃথিবীর মগজের ভেতর পাগল হয়ে গেল। তাইতো যুগের দিনরাত্রি মুচিপাড়ায় ভিড় করে। মুচিপাড়ার ভাতগুলোই নাকি এসব দিনরাত্রির প্রকৃত বন্ধু। কত জোড়া জুতা আছে পৃথিবীর ভেতর? কত জোড়া পৃথিবী আছে জুতার ভেতর? মুচিপাড়ার ভাতগুলো এ ভাবনায় মরে। এই তো উদ্বাস্তু পায়ের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে জগতের উদ্বাস্তু সীমানায় বসে বসে ছেঁড়া পৃথিবী সেলাই করে আমাদের নিতাই কাকা, আর এক জোড়া ছেঁড়া জুতার গলা বেঁধে দিনরাত জিজ্ঞাসাবাদ— 'বল পৃথিবীতে নেমে আসা সুবর্ণ ভোরগুলো কোন দিকে গেছে?' শুধু কি তাই, জুতার কপালে যতবার হাতুড়ি পড়ল ততবার ফাটা কপালের রেখাগুলো চলে গেল চৌচির ভূগোলের ওপর। আর ফাটা পৃথিবীর মাথা সেলাই করতে করতে নিতাই কাকা এভাবেই জেনেছিল, সুবর্ণ ভাতগুলো এ পাড়ায় আর ফিরবে না। তবে কি উদ্বাস্তুদের মানচিত্র জুতার ভেতর গোপন হয়ে গেছে? এই নিরন্তর প্রশ্নের মুখে আক্রান্ত হয়ে আছে নিতাই কাকার ভাতের থালা। আর বহুকাল না খেয়ে খেয়ে একদিন যখন নিতাই কাকা স্বপ্নের ভেতর অনেক ভাত খেল, তখন স্বপ্নের ভেতর ভাসমান ভাতগুলো নিতাই কাকাকে বলেছিল— জানো, উদ্বাস্তুদের কোনো মানচিত্র নেই, উদ্বাস্তুদের মানচিত্রের রেখাগুলো কেটে কেটে বানানো হয়েছে পৃথিবীর সমস্ত জুতার ফিতা।

চৌদ্দ

এই তো আগুন দিয়ে আমার চুমুগুলো পুড়িয়ে ফেলছি। চুমু পোড়ার গন্ধে মাটি থেকে বেরিয়ে আসছে এক ধরনের ভাতপাখি, যাদের ডানায় কেবল দুর্ভিক্ষের উচ্ছ্বাস। তবে কি চুমু পোড়ার গন্ধই পৃথিবীর প্রকৃত সুগন্ধি? গলাকাটা অন্ধকারগুলো সকল প্রশ্নের উত্তর? কী প্রশ্ন ছিল প্রাণের চারকোনায়? আয়ুবাদী অন্ধকার দিল না কোনো উত্তর। এই রক্তে যত আগুনের আকাঙ্ক্ষা সবই গেল আঁধারের পথে। ও পথে কী থাকে? লাল হতে হতে অধিকতর লাল পাথরগুলো ও পথেই হেঁটে যায়... কে তবে আপন হলো— প্রাণ, নাকি প্রাণের ভেতর অপচয়কারী বেড়াল? তবে কি আমার ভাতগুলোই আমার শাশ্বত অন্ধকার? যারা আপন হতে হতে এ জীবনের কাছে এসে করেছে ছলনা, এই দেহের ভেতর যত ছলনার আকাঙ্ক্ষা... তাইতো ভাতগুলো কাজল পরেছে, চুল বেঁধেছে, বাঁকা মেরুদণ্ডের কাছে করে গেছে আগুনের তর্জমা...

আর আমি আগুন শিখব বলে, ভাতের পাঠশালায় চিতাকাঠের মতো বসে থাকি, ভাত শেখায় 'পৃথিবী' আমি শিখি 'ভুল', ভাতেরা জোগাড় করে তিনটি কাঁটা, আমি খুঁজে বেড়াই তিনখানা মরণ। ভাতগুলো এবার আমার পেটের ভেতর আয়োজন করে বড় বড় কার্তিক মাস... আমি তখন ছোট ছোট মৃত্যুগুলোকে ঘোড়া বানাই। ভাত বলে 'ভেতর' আমি বলি 'বাহির'। আয়ুর ওপর পড়ে কত চাবুকের বাণী, তবু এক মরণের সাথে আরেক মরণের লাগে না জোড়া...

পনেরো

যুদ্ধের দিকে পা করে শুয়ে আছে যে মেরুদণ্ড তার নাম কি জানো? 'রহুচণ্ডাল।' মাটির ঝটকা খুলে খুলে আমরা এসব কথা জেনে যাচ্ছি। কালো মাটির ভেতর আমরা সবুজ শেকড়, মাটির দীর্ঘ সহবাসে জেনে যাচ্ছি কপালের রক্তটুকুই সুস্বাদু। আর কোনো এক নুনের বাক্সে জমে ওঠা পরিত্যক্ত নক্ষত্রের আর্তনাদ দেখে মনে হয়, নুন কি নক্ষত্রের বিদেহী আত্মা? এই দেহ কি বিপদের কুরুক্ষেত্র? দেখি নুনগুলো ঢুকে যাচ্ছে কোনো এক বিপদের দিকে...

তোমরা কি স্বপ্নের ভেতর বিপদ দেখনি? ভাতের মাটিতে হেঁটে হেঁটে তোমাদের পায়ের অন্তরে কি উঠে আসেনি বিপদের নানান স্বরবর্ণ। তোমরা একবার জেনে দেখ বিপদের কথা, যা আমরা বহুদিন আগে জেনেছি। বিপদের ঘোড়াগুলো ঘুমের হাসি খেয়ে বাঁচে। বিশ্বাস কর, তোমাদের পূর্বপুরুষের মৃতরস দিয়ে তৈরি হয়েছে আমাদের আত্মা। আমরা সবুজ শেকড় ঠিক তোমাদের ঘরের শিশুটির ডাকনামের মতো, আমাদের ঘুম ভেঙে গেলে আমরা তোমাদের বিপদগামী পাগুলো দেখতে পাই। আর মাটির ভেতর নড়েচড়ে আগাম জেনে যেতে পারি তোমাদের জেগে থাকা, ঘুমিয়ে থাকা এমনকি তোমাদের উত্তরসূরিদের রক্তের রেখাগুলো বিপদের সাথে বেঁধেছে ঘর। বিপদে আছে তোমাদের ভাতের থালা, পানপাত্র, লাল সবুজ মার্বেলগুলো। আর এমনি এক বিপদগ্রস্ত বিপদের দিনে তোমাদের ভূখণ্ডকে ধরে নিয়ে গেছে কারা যেন। বিশ্বাস কর, আমরা সবুজ শেকড় আর এটাই আমাদের একমাত্র জবানবন্দি...

ষোলো

তোমাকেই বলছি ও অপমানিত পাথর, এই অন্তর থেকে অর্ধপোড়া চাকুখানা খুলে ফেল। আমার দেহের ভেতর লাল লাল ভাতগুলো নেচে উঠেছে। শাশ্বত রাত্রির বুকে বেজে ওঠা ঘণ্টাধ্বনি শুনেছি, রাতের বুকে কারা যেন পুঁতে গেছে ভাতের কাঁটা আর ডাকোবুকো করে ওঠা রাতের কাছে জেনেছি, এ দেহের ভেতর নাকি ঢুকে পড়েছে ভাতের নর-নারী। ওই যে ভূখণ্ডের ডাহুক ভাতগুলো, যাদের আদি চেহারা ছিল বুলেটের দানা, তারা নাকি প্রতিদিন আমার ক্ষুধার সামনে মেলে ধরে অনন্ত বাসনার আক্ষেপ। বুঝি না তো কোনোদিন ভাতের চোখের জল ভাতের আর্তনাদ। আজ কেন দেহের ভেতর ভাতের বাঁশখুঁটি ভেঙে গেল...

এই তো বিশস্ত গোলাকার অহংকারী থালা, যার ওপর শাদাকালো সত্যগুলো রঙিন হয়ে ওঠে। ভাতেরা কি আর বেদনা জানে? অথচ এ জীবন যেন এক বেদনার খামার আর ভাত যেন ক্ষুধার কাঠে লেগে যাওয়া আদিম ঘুণপোকা। তাইতো আমার ক্ষুধার হাত পেঁচিয়ে কিছু ভাত ঢোল বাজায়, কিছু ভাত বরনে তোলে কালো পাড়ের কাপড়, কিছু ভাত বাঁশি বাজায়, আর আমার অনাহারের ভেতর কী এমন অভিজ্ঞান খুঁজে পায় ভাতের দারোগা পুলিশ? পৃথিবী তোমার চোখ নামাও ভাতের যজ্ঞে, দেখ কালো টিপ পরে আছে শাদা ভাতের কপাল, মাথায় পাগড়ি বেঁধেছে ভাতের সুপুরুষ। ওরা এ দেহের ভেতর ঢুকে কার যেন গান শিখে যাবে। আর এমনি করে নিরন্তর রক্তের ভেতর ঢুকে পড়া ভাত, শুধু ভাত! কখনো মুখের ওপর, কখনো বুকের মানচিত্রে চিরকাল ধড়ফড় করে মরে...

সতেরো

ঘড়ির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ভাতগুলো চলে এসেছিল মরা মানুষের কাছে। তরল মাদকের মতো সময় পান করে করে ভাতগুলো বুঝেছিল মৃত আত্মাই প্রকৃত ঘড়ি। তাইতো আত্মার ভেতর ভাতগুলো কোরাস করে ওঠে, 'সময় একটা দুর্ভাগ্য! আর সময় বহনকারী ঘড়িগুলো যে কোনো উন্মাদের প্রকৃত বন্ধু।' ভাতগুলো এবার মৃত মানুষের সাথে আলাপে মেতে উঠল, পাঠ করল তার জিহ্বা আর তারা দেখতে পেল এই জিহ্বা অনাগত কোনো উদ্ভিদের পাতা। ভাতগুলো এবার ভাগ হলো, কেউ কেউ ছুটে গেল মরা দেহের অন্তরের দিকে... কেউ কেউ নিস্তেজ মাংসের ভেতর। মৃত অন্তরের ভেতর দেখা গেল জগতের লাঞ্ছিত রেখাগুলো ভাগ্যাহত ভূখণ্ডের মতো শুয়ে আছে। ভাতগুলো এবার সমবেত হলো মরা দেহের চোখের ভেতর আর সেখানে তারা দেখতে পেল মাটির বিপন্ন শিশুরা মেতে গেছে দৃশ্য আর ক্ষুধার যুদ্ধে।

মৃতদেহের ভেতর ভাতগুলো এবার দেখল মাটির পেন্ডুলামগুলো নড়ছে। তারা অনুভব করল নিশ্চয় মৃতব্যক্তির ফুসফুস হতে নির্গত হচ্ছে হাওয়া। অমনি তারা কান পেতে দিল স্তব্ধ প্রাণের দিকে। আর মরা দেহ যেন বলতে লাগল— বিপন্ন আগুন থেকে উঠে এলে বুঝি? তবে তো জেনে গেছ এ দেহের কোন দরজা সবুজ। আর এমনি করেই মরা গলায় আটকে থাকে খ্যাপা মেঘের ইচ্ছা, জগতের যে কোনো মৃতই মাটির পূর্বপুরুষ। তাইতো জীবনভ্রমর ভাতেরা এই দেখ মৃতের হাত, আদরমাখা অথচ মাটির গোপন খাতায় এ হাতের নাম ঘড়ির কাঁটা। কে তোমার নাম দিয়েছিল ভাত! মাটির গভীর থেকে জানা গেল মরণের মরণ। তবে কি মরা দেহের ভেতর উঠেছে মেঘ? কে তবে অপার! মৃত্যু নাকি বৃষ্টি? ভাতগুলো এবার দেখতে পেল জগতের থালাগুলো উন্মাদ হয়ে গেছে। আর তারা অনুভব করল নিশ্চয় মাটিগুলো উন্মাদের মতো হেসে উঠেছে...

আঠারো

আত্মসন্ধানের বহুগামী পথে অন্ধভাতেরা এবার দেখতে পেল, মানব অন্তরের পৃষ্ঠাগুলো পোড়া কাঠের মতো আর তারা উঁইপোকার মতো অন্তর কাটায় পারদর্শী হয়ে উঠল। অন্ধভাতের দাঁত ছিল পৃথিবীর প্রথম মানবহত্যার ছুরি। আর এভাবেই যখন তারা অন্তরের প্রথম স্তর কেটে ফেলল তখন দেখতে পেল বাঘের দুগ্ধে ভিজে আছে একগুচ্ছ বিপন্ন চাবি। আর চাবিগুলো প্রেম হতে হতে, মৃত্যু হতে হতে দুঃসময় হয়ে বসে আছে। ভাতগুলো এবার মানব অন্তরের দ্বিতীয় স্তরে ঢুকে গেল আর সেখানে দেখল দিনরাত ভাঙাভাঙি, কার্পাস তুলার মতো কে যেন আসে যায়, একবার মনে হয় বেড়ালের ছায়া আরেকবার মনে হয় অমীমাংসিত হাওয়া। তবে কি মানব অন্তর সেসব ভাতের জাদুঘর? যারা রাতকে করেছিল ঘোড়া, দিনকে করেছিল মৃতদের ঘুমের আস্তানা। ভাতগুলো এবার খনন করল মানব অন্তরের তৃতীয় স্তর আর সেখানে দেখতে পেল কিছু উন্মাদ মুদ্রা বাড়ন্ত বিপদের মতো ধড়ফড় করছে। ভাতগুলো নিশ্চিত হলো পিতলের রক্তে ডুবে গেছে চাঁদ, নিশ্চয় এ চিঠি মানব অন্তরের লেখা, তাইতো তারা আত্মসন্ধানের বহুগামী পথে অস্থির হলো, আর পাঠ করতে লাগল ভাতের কাছে লেখা মানব অন্তরের অচিন অক্ষর...

ক্ষমা কর ওহে নিরন্তর ভাতলিপি, তোমার মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী। আর আমার মৃত্যুর জন্য দায়ী কোনো এক ভাতের জন্মান্তর। এই তো তোমার ঘুঙুর থেকে লাফিয়ে পড়া বেড়াল, সে বেড়ালই আমার মৃত্যুর ডাকনাম। তাইতো প্রতিটি ক্ষুধার প্রহরে আমি তোমার মৃত্যু অনুভব করি। আমার দাঁতের ফাঁকে তোমার মৃত্যু হয়। জানি মাটির কোলে তুমি দুরন্ত কিশোরী ছিলে, আর তোমার সহপাঠী ছিল যে কোনো শূন্যের হাওয়া, তোমার পিতৃকুল মাজা বাঁকা ছিল বলে তারা চলে গেছে ক্রীতদাসের পাত্রে, তোমার মা কপাল ভাঙা ছিল বলে তাকে যেতে হয়েছে কোনো এক দাসীর থালায়। আমার বেঁচে ওঠা কিংবা মৃত্যুর নমুনা দেখে ভেব না তোমার আত্মচিৎকার আমার মনে নেই। ওই তো পেটে চলে যাবার আগে তুমি যখন আমার মুখের ভেতর রেখে যাও অবিনাশী চিৎকার! আমি তা জমা রাখি পুনর্জন্মের ভেতর।

উনিশ

আমাদের দেহ খনন করে কিছু ভাত ছাড়া আর কোনো সত্য পাওয়া যায় না। অথচ এ জীবনে লুকিয়ে রাখা যত সব বাঁকা ছুরি সবই করেছে আত্মগোপন। আর এমন আত্মগোপনের বাঁশি যেদিন বেজে উঠল তোমার দেহে, সেদিনই জেনেছিলাম ভাতের সূর্য কেবল গোলাকার নয় তার ভেতর আছে এক গলাকাটা মঙ্গল। এ দেহ ভাতের উপাধি! তাইতো কোনো উৎসব পেলেই আমরা ছুরিগুলো দেহ থেকে বের করে ফেলি। কে কার খনন করে? তার প্রকৃত জিজ্ঞাসা জেগে আছে একটা ভাতের আত্মজীবনীতে...

ভাতেরা জেনে গিয়েছিল মানবশিশুর দাঁত বেরিয়েছে, তাকে আজই প্রথম খাওয়ানো হবে ভাত। তাইতো মানব ঘরে হলো কত সাজসজ্জা। আর ভাতের ঘরে ভাতশিশুকে প্রস্তুত করা হলো, কাজল পরানো হলো, সিঁদুর মাখানো হলো আর শিশুভাতটির কানে কানে বলা হলো, তুমি সেই সৌভাগ্য প্রাণ যা কিনা মানবশিশুর দাঁতের ফাঁকে মৃত্যুর গুঁড়ো হয়ে যাবে... তোমরা যারা ভাত জীবনীর প্রথম পৃষ্ঠাটা পড়েছ তারা নিশ্চয় জানো সে পৃষ্ঠার পুরোটাই শাদা, শাদা চোখ আর শাদা জল। সেখানে দগ্ধ ভাতের শিশুরা মৃত্যুর নামতা ছাড়া আর কিছুই জানে না। আমাদের জানা নেই ভাতেরা কখন কখন কাঁদে। নিশ্চয় ভাতের কান্না থেকে নির্গত হয় গলিত আগুন। ভেবে দেখ ভাতের শেষ পৃষ্ঠার কথা, কী লেখা আছে তাতে? সম্ভবত পাঠ করেছিলে সে পৃষ্ঠার মর্মকথা, নিশ্চয় ভাতের শিশুটি কেঁদে উঠেছিল পৃথিবীর কোনো এক শিশুর প্রথম ক্ষুধার ভেতর, আর ওই শিশুর আয়ুর ছুরিগুলো আরো শাদা হয়ে গিয়েছিল ভাতের শাদা রক্তে...

এ জীবনের কোনো এক নিশুতি ঘুমের ভেতর যখন আমাদের শাদা চোখগুলো জেগে ওঠে তখন শাদা শাদা সত্যগুলো কেবল ভাসমান, কোন নিশুতি জলে ভেসে ওঠে এসব অভিজ্ঞান? এই তো আমাদের প্রাণের শূন্যতায় সমবেত হয়েছে ভাতের শিশুরা, যাদের ধর্মে কেবল আত্মাহুতির প্রার্থনা ছাড়া আর কিছুই নেই...

বিশ

এমন করুণা জেগে থাকে আমাদের জীবনে যার ভেতর ওড়ে শুধু ভাতের ফড়িং। এ এক অনিবার্য দ্রাঘিমাংশ, যা টুকরো টুকরো ভাতের মতো আস্থাশীল। বহু আয়ুর সন্ধান করে অবশেষে জানা গেল সকল ব্যথাই বিপদগামী। এ করুণার মরণ হলো না অথচ এ করুণা, এ সত্য গ্রহণকারী সবাই মরে গেল। কে বেশি সত্য— মৃত্যু, নাকি মৃত্যু গ্রহণকারী? এমন প্রশ্ন জাগে ভাতের ভূগোলের আনাচে কানাচে। কার পায়ে বাঁধা ছিল এ মরণের সকাল সন্ধ্যা, কে দেবে উত্তর? আর কেই বা দেবে সেসব প্রশ্নের নিশ্চয়তা, যে প্রশ্নের উত্তরে কেবল টুকরো টুকরো ভাতগুলো মরণের অভিধান হয়ে যাবে। হাতে এসেছে কি সেই কাঙ্ক্ষিত ভাত? যার আঘাতে মারা যাবে শয়তানের আত্মীয়স্বজন। ভাত মারা যাবে কবে? কী তার দিনক্ষণ? এই তো শরীরে ঝরছে করুণা গ্রহণকারী ঘাম, এই তো ভাতের ঘামে উড়ে গেল কিছু অনার্য হাঁস, সেই হাঁসের পিঠে চড়ে এ করুণা কোথায় চলে যায়, কার চোখে মুখে লাগে? সেই মুখ থেকে ফিরে আসে করুণা, সেই চোখ থেকে উড়ে আসে ভাতের ফড়িং।

একুশ

ভোজনসভায় মৃত্যুগামী ভাতটি যখন কথা বলছিল তখন সবকিছু গর্ভবতী হয়ে উঠছে। এই যে ধরুন ঘরের পিঠ, উঠোনের আকাশ, এমনকি বহুদিন পাথরের গায়ে লেগে থাকা পাথরও। কী এমন কথা জেগেছিল ভাতের মুখে? সেকথার মাথাটা গোলাকার, যার কক্ষপথে ঘুরছে ভাত আয়োজিত রথের চাকা। তবে ঘোরানো যাক সে চাকা, যার ভেতর বাহির একটা শক্ত গল্পের মতো শক্ত। এক যে ছিল এক আমাদের ভোলা কাকা, আর যে ভোরে জন্মেছিল তার মৃত্যুর ঘাস, সেই ভোরে জীবনের সকল ঘুম ভেঙেছিল সে। আর অমনি কোথা হতে কিছু ঝাড়ু এসে গেল— চাঁদের ঝাড়ু, সূর্যের ঝাড়ু, কত রকমের ঝাড়ু এসে জমা হলো ভোলা কাকার পাঁজরে। তার পাঁজরে কত রকমের ধুলা জন্মেছিল? এমন প্রশ্নের উত্তরে ডাহুক কি আর বসে থাকে? তাইতো ভোলা কাকাকে বলেছিলাম, যে ধুলো বুঝেছিল উঠোনের মর্ম তাকেও কি তাড়াবে বিপদে? অবশেষে আরো এক ডাহুক এল ভোলা কাকার মনে, কেন জানি আজ আমার উঠোনে অনেক মানুষ হবে। কারা এসেছিল ভোলা কাকার উঠোনে? সেসব মানুষের কোনো দেহ ছিল না, মানুষগুলো এসে ভাগ করে দিল ভোলা কাকার আয়ু। কিছু আয়ু ধুলো হলো, কিছু আয়ু ঘাস, কিছু আয়ু বলে ওঠে এ জগতে ছিল নাকো ভোলা বাবুর বাস। কথাটা সে যখন বলেছিল তখন আর কিছু নয়, তারই কিছু আগে অনেকগুলো ভাতের মৃত্যু হয়েছিল...

বাইশ

পাগলা গারদের ভাতগুলো কত রকমের চালাকি জানে— গান গায়, নাচে, পান করে, এমনকি রূপকথা ছাড়া আর কোনো কথা জানে না। হাতে বাঁধা শেকল, পায়ের কাছে উল্টে থাকা থালা— এই নিয়ে তাদের দিনরাত হাসাহাসি। আর সে ভাতের একি বিস্ময়কর কায়দা! পাগলের মুখে ঢুকে দাঁত হয়ে যায়। গারদের লোহা বেয়ে পিল পিল করে ওঠে, দেখে মনে হয় ওরাই সার্কাসের প্রকৃত খেলোয়াড়। ভাতগুলো খুব ভালো করেই জানে গারদের চারকোনার দৈর্ঘ্য প্রস্থ, এ মাথা ও মাথা হাঁটাহাঁটি করে জেনে যায় খ্যাপাগুলোর ক্ষুধার মর্ম। তাইতো তারা পাগলের পিঠে চড়ে আজান দেয়, হাসে, কাঁদে আর গারদের মাথার ওপর ঝুলে থাকা লাইটগুলোকে তামাশা করে বলে— জানো, আমরা কত অহংকারী? শুধু কি তাই! জগতের সকল তামাশা জানে পাগলা গারদের ভাত, জানে বারো রকমের চিৎকার, তেরো রকমের শীৎকার, নারকি যুগের হাসি আরো কত কী! এভাবেই তারা তাদের পাঠশালায় ডেকে আনে গারদের পাগলগুলোকে আর বলে আমাদের যজ্ঞে তোমরাই প্রকৃত বিদ্বান, তোমরা স্বর্গ জানো না, নরক জানো না, এমনকি ভাতের নরম দেহখানাও বুঝতে পার না...

তেইশ

বর্জ্যখানায় ছুড়ে ফেলা ভাতগুলো পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে এক পলক হেসে উঠল... আর হাসতে হাসতে বলে উঠল, রক্ত দেখতে অনেকখানি আমাদের শেষ ইচ্ছার মতো, এসো আমরা হেসে হেসে বেদনা সৃষ্টি করি। আর অমনি বর্জ্যখানায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ভাতগুলো হাসতে শুরু করল। আর ভাতের হাসির ভেতর ফুটতে লাগল মৃত্যুর সূর্যমুখী। ভাতগুলো এবার একে অপরকে বলতে লাগল, আমরা যা দেখতে পাচ্ছি তোমরা কি তা দেখতে পাচ্ছ? আমরা দেখতে পাচ্ছি এক হত্যাকারীর সূর্য। উত্তরকারী ভাতগুলো বলল, নিশ্চয় এ সূর্য লুকিয়ে আছে অস্থির মানচিত্রের অন্ধকারে। প্রশ্নকারী ভাতগুলো এবার বিলাপে মেতে উঠল, আর উত্তরকারী ভাতগুলো দেখতে পেল ভোজনসভায় ভাত হাতে বসে আছে অনাগত এক মৃত্যুগ্রহণকারী। প্রশ্নকারী ভাতগুলো আবারো বলল, আমরা এবার দেখতে পাচ্ছি ওই মৃত্যুগামীর না বলা কথাগুলো। উত্তরকারী ভাতগুলো বলল, নিশ্চয় একথা লেখা আছে হত্যাযজ্ঞের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা কোনো এক গাছের পাতায়। তবে কি সমস্ত গাছের পাতাই জীবিতদের কাছে লেখা মৃতদের চিঠি? ভাতগুলো এবার দুর্গন্ধ আর মৃত্যুকে রাখল এক পাত্রে। আর দেখল দুর্গন্ধ যখন শাদা হয়, মৃত্যু তখন লাল। তাইতো ভাতগুলো ছুটে গিয়েছিল অনাগত হত্যাযজ্ঞের দিকে, আর পাঠ করেছিল এক মৃত্যুগামীর আপন মৃত্যুর কাছে লেখা আপনার চিঠি...

'এ দেহ এক আগুনের ডাকবাক্স। আর এমনি করে কত কিসের ডাক আসে দেহের ভেতর। পুরনো কোনো আকাঙ্ক্ষার কাছে জীবনের সকল স্তুতি পাহাড় হয়ে থাকে। সেসব ডাকের কি কোনো ডাকনাম আছে? যা সহসাই বলে দেয়া যায় 'অন্ধকার'। আগুনমুখো ভাতগুলো চোখেও দেখে না, কানেও শোনে না, শুধু পাঁজরের উত্তর-দক্ষিণ অঙ্গার করে তোলে। ওই আগুনের ভেতর তুমি কতদিন রেখেছিলে হাত, আমি ভেবেছি নিমপাতার উর্বর ভূমি। সময় মরে যেতে বেশি দিন লাগে না, আমাদের মতো সময় বেঁচে থাকে না, তাইতো তোমার ঘুমের যজ্ঞ থেকে যত রক্ত গড়িয়ে যায় তার সবটাই পৌঁছে যায় কোনো না কোনো বঞ্চনার কাছে। এসো দূর হই, হারিয়ে যাওয়া ভাতের মতো আর জেনে নিই প্রকৃত মানচিত্রের আকাঙ্ক্ষা। বলি না তো আর ভূখণ্ডই

তোমার আমার শিশু, অথচ এ দেহের কাছে আসে ভাতের চিঠি, ভাতের কাছে যায় ভূখণ্ডের চিঠি। কে লেখে এমন চিঠি? জানা হলো না, কোনোদিন জানা গেল না।'

চব্বিশ

তোমরা ভালো করেই জানো আমরা ভাতের জাত, আমাদের হাত নেই, তবুও এই যে আমাদের হাত বেঁধে আনলে তোমাদের বেঁচে থাকার যজ্ঞে তাতে কি কোনো ভুল ফুটবে কোনো ফুলের গাছে? আর তোমাদের মতো ফুসফুসতাড়িত বাতাস আমাদের নেই, আমাদের কথার ভেতর নেই কোনো শব্দ। তাইতো জেনে রাখ ভাতের জবানবন্দি অনন্ত জিজ্ঞাসার ভেতর ঘুরপাক খায়। তোমরা বাঁচার জন্য আমাদের খাও অথচ আমরা বাঁচার জন্য সারা জীবন না খেয়ে থাকি। তাইতো প্রতিটি ভাতের স্কুল নিশুতি রাতের মতো নিরক্ষর। 'না জানি না,' 'না তাও বলতে পারব না' বরং তোমরা অনুভব করতে পার তোমাদের আহারের গোলাকার যজ্ঞে কোন কোন পৃথিবী আসে। আমরা কি বলেছি আমাদের ঘুম নেই? ওই একবার মাটির গভীরে এসেছিল আমাদের ঘুম, তারপর তোমাদের গরম জলে প্রথম এবং শেষবারের মতো করেছি স্নান, আমাদের গায়ের রঙ কখনো শাদা ছিল না, মাটির গর্ভে আমরা ছিলাম আগুনের মতো। অথচ তোমাদের রন্ধনশালার আগুনে পুড়ে আমরা হয়ে গেলাম শাদা। দয়া করে এ বৃত্তান্ত অনুভব কর, আর অনুভব কর তোমাদের ক্ষুধার থালাই আমাদের মৃত্যুর ভূগোল। একবার ভেবেছ কি থালার ওপর সমবেত শত শত ভাতের অভিজ্ঞান? থালা থেকে ছিটকে পড়া কিছু ভাতের বিদ্রোহ? কিংবা ঘুমকাতুরে সেসব নিরীহ ভাতের আকুতি যারা মৃত্যুর ভয়ে আঙুলের ফাঁকে লুকিয়ে গিয়েছিল? আর অবশেষে তোমাদের জিভ দিয়ে ছিঁড়ে দিয়েছিলে তাদের প্রাণ। শুনতে পেয়েছিলে কি সেসব ভাতের চিৎকার যারা মাটির গর্ভ থেকে পাকস্থলী পর্যন্ত শুধু মৃত্যুর অভিজ্ঞান নিয়েই বেঁচে ছিল...

পঁচিশ

এসো এসো, সমবেত হও— আমাদের যাঁতাকলে যেতে হবে আর ভুলে যাও গুদামঘর ও ভাপাখানার কষ্ট। ভয় পেয়ো না, ভাতের জীবনে কোনো ভয় নেই বরং একথা ভেবে খুশি হও যখন আমাদের পূর্বপুরুষের প্রাণ ঢেঁকিছাঁটায় চেপ্টা হয়ে যেত, এমনকি যাঁতাকলে পৌঁছানোর আগে তোমরা যে যার মতো গান কর, যে গানের প্রকৃত অর্থে কোনো সুর নেই, কোনো কথা নেই। এবং এরই মধ্যে কেউ যদি ভালোবাসা শিখে থাক তবে জেনে রাখ— ভাতের বৃন্দাবন মানুষের মতো নয়, ভাতের ভালোবাসা মানুষের ক্ষুধা। তাইতো যাঁতাকলের দাঁতগুলো ক্ষিপ্র হয়ে ওঠার আগে মনে কর পূর্বপুরুষের শেখানো মন্ত্র, আর একথা ভেবে নিজের প্রাণের কাছে নিশ্চিত থাক, ভাতের চামড়ায় কোনো জুতা হবে না। ওই তো কোনো এক অগ্রহায়ণ এসে জীবনের কাছে রেখে গিয়েছিল মাড়নের মাঠ। সেই মাড়নের মাঠ থেকে ভূগোলের যাঁতাকল সমস্ত আলোর ভেতর আমাদের পীড়নগুলো চেঁচামেচি করছে। ভাতের জীবনে কি আর যন্ত্রণা আছে? আমরা যখন যখন আসি অকাতরেই আসি আর নির্মোহ হাসির ভেতর ভেসে বেড়াই। তাইতো আর দেরি নয়, চল যাঁতাকলের দাঁতের ফাঁকে দ্রুত ঘুমিয়ে পড়ি কারণ আমাদের ছায়ার কালিতে লেখা হবে মানব অন্তরের ভাগ্যের পদাবলি...

ছাব্বিশ

আমরা সেই সৌভাগ্য ভাতজাতি যারা আগুন পানি একসাথে খাই। আর তখন আমাদের মনে থাকে না উত্তপ্ত হাঁড়ির ভেতর কোনটা বেশি স্বাদের, আগুন নাকি পানি। তোমরা কি ভাতের নিশ্বাস উড়ে যেতে দেখেছ? বাষ্পরূপে আমাদের নিশ্বাসগুলো যখন উড়ে যায়, তখন আমরা জেনে যাই আগুন পানির প্রকৃত মর্ম। আমরা ততটুকুই নরম যতটুকু আমাদের বিধানে আছে, আমরা ততটুকুই খুলে ফেলি যতটুকু আমাদের বাঁধনে আছে।

আর এমনি করেই আমাদের মনে পড়ে সেইসব সতীর্থের কথা, যাদের বস্তাবন্দি করে নিয়ে গেছে আফ্রিকার দিকে, এশিয়ার দিকে। আমরা সবসময় ক্ষুধার্তদের নজরবন্দি। ক্ষুধার নজর সে এক মৃত্যুর সমন। তাইতো ক্ষুধার তাড়া খেয়ে খেয়ে অন্তর ভেঙেছি পৃথিবীর পাথর খণ্ডে। জন্মের ঘোড়া যতদূর যায় ততদূর অন্ধকার— অবশেষে জেনেছি ভাতের হাঁড়িই পৃথিবীর উর্বর মগজ। তাইতো এ উত্তপ্ত হাঁড়িই আমাদের কান্নার অনিবার্য গুহা। আর এই হাঁড়ির মুখ উপচে পড়া ভুড় ভুড় শব্দগুলো আমাদের জাতভাইদের প্রতি একমাত্র স্মৃতিচারণ। বিশ্বাস কর, আমরা সেসব ভাতের কথা ভুলি নাই যারা মাড়নের যজ্ঞ থেকে বিদায় নিয়েছিল, তারা এই হাঁড়ির ভেতর আগুন পানি গ্রহণে অক্ষম ছিল, তাইতো এ দেহের ভেতর গলে ওঠা অস্থিমজ্জা মাড়ের মতো গড়িয়ে যায় পৃথিবীর আস্তিনে। তোমরা কি কখনো ভূখণ্ড দেখেছ? হাঁড়ির অন্তরে জন্মে ভূখণ্ডের রক্ত। কে মেরেছে ভূখণ্ডে বাণ? খণ্ড খণ্ড ভাত নিয়েছে ভূখণ্ডের ভার...

সাতাশ

অনাদিকালের রক্তপিঠে ওই উড়ে যায় ভাতের কবুতর অথচ আমাদের পিঠের রক্তগুলো কেমন হিম হয়ে আছে। কোথায় যায় ভাতের কবুতর? বুকের ভূগোলে তার ছায়া পড়ে যেন। এ জীবনে গ্রহণ করেছি যত ভাতের জাদু তার সবই হয়ে গেছে কাচ। তাইতো দিন রাত কাচগুলো পাঁজর কাটে, দেহের আখ্যান কাটে। আমাদের পিঠের রক্তগুলো কোনো এক জনমে ছিল সুস্বাদু পোকা। কোন আসমানে ওড়ে ভাতের পাখি? সেই আসমানে মেঘের সাথে ভাতের রমণধর্ম। অথচ আমাদের মেঘগুলো যখন তখন ভাতযুদ্ধে মেতে থাকে। ভাত যত উঁচু হয় আকাশ তত নিচে নামে, আকাশ যত উঁচু হয় ভাত তত নিচে নামে। এ যেন জমিনের কারবার, বারবার হেরে যেতে হয় ভাতের মুদ্রার কাছে। এ পৃথিবীতে অবিরত ঘুরছে ভাতের মুদ্রা, সেসব মুদ্রার কাছে যতবার হুমড়ি খেয়ে পড়েছে আমাদের মুখ, ততবার বদলে গেছে পৃথিবীর গতি।

আমরা কি ক্ষুধার ভেতর বুঝেছি ভাতের মকরক্রান্তি? বহু বহু পীড়নের দাবি তুলে ভাতগুলো চলে গেছে অনন্তের পথে। আমরা কি ফেরাতে পেরেছি ভাতের আয়ু? আমাদের আয়ুর সাথে ভাতের আয়ুর কেবল বেড়েছে বিরোধ। তবে কি চন্দ্রগ্রহণের দিন এ দেহ মাটি হতে ভুলে গিয়েছিল? আর ভাতগুলো এ দেহের কাছে এসে করেছিল মাটির সন্ধান? এ নিরন্তর প্রশ্নের কাছে কেঁদে গেছে ভাত, এ জীবনের ভুয়া মাটির কাছে এসে পাখি হয়েছে ভাত, তাইতো অনন্ত সত্যের দিকে লেগেছে ভাতের চন্দ্রগ্রহণ...

আটাশ

কোনো এক ভাত তাদের প্রার্থনাসভায় বলেছিল, কেবল মানুষের খাওয়ার দৃশ্যটাই অধিকতর বর্বরোচিত। আর প্রার্থনায় অংশগ্রহণকারী সকল ভাতই দিয়েছিল হাততালি। কেউ কেউ বলেছিল মানুষের জিহ্বার মতো আর কোনো ছুরি নেই যা দিয়ে একসাথে এতগুলো প্রাণের গলা কাটা যায়। এভাবেই চলছিল তাদের প্রার্থনাসভা। আর সভাতে জ্বলছিল এক বেগবান আগুনের শিখা। মানুষ যেদিন জীবন থেকে বেরিয়ে গেল আগুনের দিকে, আগুন সেদিন সভা থেকে বেরিয়ে গেল মানুষের দিকে। আর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল ভাতের হাততালি। প্রার্থনাসভা থেকে ভাতগুলো যখন পৃথিবীর দিকে হাঁটতে লাগল তখন তাদের পা থেকে মাথা পর্যন্ত সর্বত্রই করছিল কোরাস— 'মানবসেবায় আমরাই শ্রেষ্ঠ।' তখন মনে হয়েছিল এই পৃথিবী যেন বিস্তীর্ণ হাসপাতাল আর তার ভেতর সেবা নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে ভাতের নার্সগুলো। ভাতের যজ্ঞে কোনো সূত্র নেই তাইতো ভাতই প্রকৃত ওষুধ। যখনই প্রাণের ক্ষত উদগত হয় তখনই সে ক্ষতের ওপর প্রাণ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ভাত। অথচ প্রার্থনাসভায় থেকে গেল ভাতের আক্ষেপ, যে আক্ষেপের নেই কোনো গতি; ভাতগুলো জন্ম নিল যে গর্ভে সে গর্ভে বাসা বাঁধল মাকড়সা। মাটির অন্তর থেকে মানব অন্তর— এত অকাতরের নমুনা থেকেও ভাতকে হতে হলো জুয়ার উপাত্ত। আর ভাত-জুয়ার এমন এক নিয়তি, গুদামঘরের কাছে হেরে গেল শত শত উদামঘর। তাইতো দেখা যায়, ভাতের প্রার্থনাসভায় ভৌতিক বাতাসে উড়ছে কিছু অদৃশ্য কাগজ, যারা পৃথিবীতে চালু হওয়া লোভ আশ্রিত কাগজের কাছে চিরকাল নতজানু...

ঊনত্রিশ

এ দেহের কক্ষপথ ভরে গেছে ভাতের দেনায়, কেউ কি তা জানে কিসে তার শোধ? কিসে তার নমুনা? আর কীভাবেই বা খুলে দেয়া যায় এ দেহের পাটাতন, যে পাটাতন ভেঙে বেরিয়ে আসবে শাশ্বত রাত্রির বুকে আটকে পড়া ভাতগুলো। কতদিন জেনে এসেছি এ অন্ধকার সূর্যডোবা গোলাপ অথচ কোনো এক নির্ঘুমচক্র এসে বলে গেল এ আঁধার ভাতের হাসি। এ প্রাণের কোনো এক দুয়ারে শেকল গেড়ে বসে আছে অবিনাশী ভাতের পাহারাদার, আর ভাতের গলায় বাজে নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি। বেজে বেজে আকুল করে ব্যাকুল করে পৃথিবী। আসলে কি সূর্যের চারিদিকে পৃথিবী ঘোরে? নাকি এতকাল সূর্যের চারিদিকে ঘুরে গেছে ভাতের পেঁচা। বিশ্বাসের কাছে এসে থমকে দাঁড়াল প্রাণের নাবালক। ও নাবালক! কী খোঁজ রক্তের ভেতর? ভাতের হাসি নাকি অন্ধকার? ভাতের হাসি মিথ্যা হয়েছে, সত্য হয়েছে পৃথিবীর জিহ্বা। রক্ত কি আর লাল আছে? রক্ত এখন মিথ্যারস। এ প্রাণের লতাপাতায় লটকে পড়া ভাতগুলো যেন আদিম নিশ্বাস। তাইতো দেখা যায় আমাদের জীবনের যেখানে সেখানে উঠেছে মর্মের পাহাড় আর আমরা কেবল অন্ধ হয়ে গেছি ভাতের দেনায়। তাইতো অন্ধ চোখের কাছে জন্মেছে কত দেবতা, কত পরশ পাথরের আখ্যান। পৃথিবীর কক্ষপথে কারা যেন গাইল গান আর আমাদের প্রাণের কক্ষপথে জমা হলো ভাত, আর অমনি অবুঝ হাওয়া বইতে লাগল ভাতের পালে... ভাত! তুমি কি এ দেহের আঁতুড় ঘরে লেপটে থাকা আজন্ম শিশু, তুমিই কি প্রাণের ওপর আটকে আছ ক্রুশবিদ্ধ যিশু...

ত্রিশ

অনেক রসিকতার ছলে জলসা ঘরে ঢুকে গিয়েছিল ভাত, নাকি সেই নর্তকীর নাচের মুদ্রা থেকে ঝরেছিল ভাতের রক্ত, হাঁড়ির মধ্যস্তরে সেই ভাবনাই বসে বসে ভাবে এক বয়োবৃদ্ধ ভাত। এ কেমন ভাবনা তার? যে ভাবনায় ঘোড়া ছিল প্রথম, সূর্য ছিল দ্বিতীয়। ভাতটি ভাবে কিনা সেসব নর্তকীরা, যাদের নাচ থেকে ঝরে পড়ত লাল লাল পাথর, তাদের প্রকৃত স্বামীর নাম ছিল একটি জোয়ান ভাত। শুধু কি তাই, ক্ষুধার গতিবিধি নির্ণয়ে সে চাঁদের সাথে কথা কয়, যে আকাশ ক্ষুধার রাজ্য দখল করেছিল সে আকাশের দিকে তীর ছুড়ে মারে, আর ওই ছুড়ে দেয়া তীর মাটিতে ফেরার আগেই চতুর ভাতটি জেনে গিয়েছিল পৃথিবীর রঙধনু দুর্ভাগ্যের চেয়েও বড়। তবে কি নিরন্তর পুড়ে যাওয়া হাঁড়ির পাদদেশে জন্ম নিল কোনো ভেদ, ভ্রান্তি? তবে কি হাঁড়ির মধ্যস্তরে পুড়তে থাকা ভাতটি পৃথিবীর সকল তালাচাবির মালিক। প্রাণের অর্জুন এ জীবনে তুমি কি একবার জেনেছিলে ঈশ্বরের প্রাণে লেগেছে ভাতের পোকা? আর ওই ভাতটিই ছিল আগুনের গায়ে লেগে যাওয়া আগুন। নইলে প্রকাণ্ড আগুন প্রাণে তুলে সে কেমন করে জেনে যায় পৃথিবীর তলপেটের খবর? আর সে খবর পৌঁছে যায় জলসা ঘরে, নাচের মুদ্রায়। তবে কি আমাদের জনমের সাথে ভাতের গোপন ইশারা, তবে কি আমাদের মরণের সাথে তার রূপকথার গল্প? তাইতো যখনই অনন্তের পথে আলো নেমে আসে, তখনই হাঁড়ির মধ্যস্তরে উল্লসিত ভাতের গায়ে নামে আঁধার। কে ভেঙেছে আত্মার কাঁটা? আত্মা একটা পোড়া ফল, যার ধোঁয়া দিয়ে তৈরি নর্তকীর পূর্ণিমা...

একত্রিশ

থালার ওপর ভাতগুলো কত কিসের কীর্তি জানে। জানে মহাকালের লীলা, এক গলায় সাতবার বলি হওয়ার মন্ত্র। তাইতো ভাতগুলো অকপটে বলে, জীবনের দরগায় আমরাই সদ্‌কা। একবার মনে হয় ভাতগুলো ঘেমে আছে, আরেকবার মনে হয় পৃথিবীর দিকে ছড়াচ্ছে তাপ। আর এভাবেই ভাতের গা গতর দেখে জানা গিয়েছিল কাল মহাকাল ঘুরে এসে থালার ওপর ভেঙেছিল ঈশ্বরের ডানা। তোমরা কি ভেবেছ ভাতগুলো দৌড় জানে না? নিশ্চয় ভাতগুলো শূন্য চাকার মতো দৌড়ে আসে আমাদের থালায়। আর আমরা প্রত্যেকেই মহাশূন্য হয়ে উঠি। কারণ আমাদের থালার ওপর প্রতিটি ভাতের অভিজ্ঞান আলাদা আলাদা। আর এভাবেই প্রশ্ন ওঠে, ভাতের বেড়ালও কি তবে কোনো এক ঈশ্বর? আর এভাবেই চন্দ্রাহত রাত হতে ভেসে আসে উত্তর, কোনো এক জনমে ভাতের বেড়ালও খেয়েছিল ভাত। তাইতো থালার ওপর অসংখ্য চোখ ফুটে থাকা দেখে মনে হয়েছিল ভাতের অন্তরে লুকিয়ে আছে ঈশ্বরের খণ্ড।

তবে কি ভাতের মাথায় থেকে গেল কোনো এক প্রতারণা? নইলে কেন ভাতের ঘামে ঝরে পড়ে ঈশ্বরের জীবাশ্ম। থালার ওপর কিছু কিছু ভাতকে দেখেছি যারা মুখ তুলে আছে মাটির দিকে, যারা মুখ তুলে বলেছে মানব অন্তরই আমাদের ঈশ্বর। তবে কি ভাতগুলো কোনো একদিন খেয়েছিল ভাত? আমরা জীবনের তাড়নায় খেয়েছি কত ভাত। আর ভাতগুলো ভাতের তাড়নায় ধারণ করেছে ঈশ্বরের আত্মা। নইলে কি আর থালার ওপর জেগে ওঠে ভাতের লীলাখেলা। ওই তো ভাতগুলো যখন অনন্তের গহ্বরে ঘুমিয়ে ছিল তখন তারা ছিল প্রকৃত অন্ধ, অথচ কোনো এক সন্ন্যাস গ্রহণের পর সেই ভাতই থালার ওপর হয়ে গেল কীর্তিনাশা। তাইতো থালার ওপর শোনা যায় সন্ন্যাসী ভাতের আত্মকথা, ভাতের বেড়াল খেয়েছিল ঈশ্বরের আয়ু, ভেঙেছিল ইন্দ্রজালের সপ্তম আঁতুড় ঘর। শুধু কি তাই, ভাতের ত্রিশূল মেখেছিল ঈশ্বরের নবীন রক্ত। তবে কি আমরা সবাই যে যার ঈশ্বর? কারণ আমরা তো খেয়ে ফেলেছি সেসব ভাতের অবিনাশী আয়ু...

বত্রিশ

যতই ঘোরাই এ দেহের ভূগোল তার সবখানে ভাতের ভরাডুবি, আর ভূগোলের প্রতিটি ফোকরে উদগত সেসব ভাতের দীর্ঘশ্বাস, যারা একদিন দেহের ভেতর ঢুকে কাচ হয়েছিল, পাথর হয়েছিল... আর এভাবেই নাক ভাঙা ভাতগুলো ব্যথা হতে শুরু করেছিল বহু বহু ব্যথার ভারে। এ জীবনের কোনো এক ঘুমের ভেতর ভাতগুলো আমলকীর পাতার মতো করে গেছে কত চাতুরি কত প্রবঞ্চনা। আমি যতই ঘুরিয়েছি চাঁদের চাকা ততই সে চাকা থেকে ঝরে গেছে জ্যোৎস্নার মতো ভাত। তাইতো একটা মানুষ যখন হেঁটে যায় তখন কেবল একটা ভাত হেঁটে যায়, মানুষ যখন সমবেত হয় তখন আর কিছু নয়, কিছু ভাতের সমাবেশ। আর এভাবেই ভাতেরা পৃথিবী ঘুরে ঘুরে আমার কাছে রেখে যায় শূন্য। আমি যতবার ভাতের কাছে গিয়েছি ভাত ততবার চলে গিয়েছে শূন্যের কাছে। আর এমনি কত শূন্য এসে পূর্ণ করেছে জীবনের সকল পাত্র। জীবনের পাত্রগুলো যখন উল্টে পড়ে থাকে তখন সে পাত্রের চৌহদ্দি জুড়ে ভাতের গান ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না।

তবে কি শূন্য আর সর্বনাশের জন্ম দুর্ভাগ্যের ভেতর? এমনি এক দুর্ভাগা ভাতের সাথে দেখা হলো যেদিন, সেদিনই জানা গেল ক্ষুধা আর শূন্য তাড়া করেছে সত্যের জন্তুকে। আর এই দৃশ্য দেখে পৃথিবী লুটিয়ে পড়েছে ভাতের থালার নিচে। দুর্ভাগা ভাতটির ছিল জ্বর। তাইতো সে ঘন ঘন পান করছিল ক্ষুধার ভুল রক্ত। আর ভাতটি বলছিল, আমার পায়ের তলায় পোঁতা ছিল তিনটি পেরেক, মাথার ভেতর লুকিয়ে ছিল অচেনা কাঠঠোকরা, আর আমি যে কোনো ক্ষুধাকে সাপ ব্যাঙ বানাতে ছিলাম সমান পারদর্শী। তাইতো জুয়ার চরকায় হরিণ চিহ্নের ওপর বাজি ধরলাম পথশিশুদের ক্ষুধা, আর সে ক্ষুধার সর্বনাশ হলো, তারপর বাঘচিহ্নের ওপর বাজি ধরলাম বিপন্ন শ্রমিকের ক্ষুধা আর সে ক্ষুধাও নজর ফসকে চলে গেল দানবের পাঠশালায়। বেড়ে গেল মৃতদের তাপমাত্রা উড়ে গেল সর্বনাশের শেষ শিশুটি, হাতে রইল আটকে পড়া শরণার্থীদের ক্ষুধাগুলো, যারা ভাতের গায়ের গন্ধে চিরকাল মাতাল ছিল। এবার ঘোড়াচিহ্নের ওপর বাজি ধরলাম মাতাল ক্ষুধাগুলো আর দেখলাম ফসকে যাওয়া দৃষ্টির মতো সে ক্ষুধাও কোথায় যেন হারিয়ে গেল।

দুর্ভাগা ভাতটি এবার তার শরীর থেকে জ্বরগুলো খুলে রাখল শূন্যের ভেতর, আর সর্বনাশের ওপর মরণ কামড়ে মেতে উঠল পৃথিবী। আমি এবার দুর্ভাগা ভাতের অন্তর খুলে দেখলাম, দেখা গেল সে অন্তরের ভেতর ঘুমিয়ে আছে জুয়াঘরের ক্লান্ত হরিণ আর বাঘগুলো। আর ভাতটিকে যখন জিহ্বা দিয়ে ঠেলে দিলাম আমার অন্তরের দিকে তখন

ভাতটি বলতে লাগল 'মানব অন্তর আমরা লাবণ্যহীন জুয়াড়ি ভাত, আমরা দানবের কাছে হেরে গেছি ক্ষুধার সকল বর্ণমালা'...

তেত্রিশ

প্রিয় ভাত, এই যে তুমি শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে আছ আমার থালার ওপর, আমি তোমাকে কী করে খাব? বরং তুমিই আমাকে খাও... জনম জনম আমি তোমাকে খেয়েছি বন্ধু, মানুষ খেয়েছ কখনো? মানুষের রক্ত এক সুস্বাদু ঘড়ি যেখানে বেজে ওঠে সময়ের তেজপাতা। খেয়ে ফেল জিহ্বার মানচিত্র আর মানব অন্তর জেনে যাক মুদ্রার পিঠে চড়ে আসা ভাতগুলোর মুখ কী খেয়ে বাঁচে? মানব অন্তর, কোন ছলনার দিকে তোমার ক্ষুধার ডাঁটা বেড়ে যায়, ভাতের থালা এক বিস্ময়কর ভূগোল। এখানে এসে ক্ষুধার বালকেরা হুমড়ি খেয়ে পড়ে, এখানেই এসে নেচে ওঠে ভাঙা ঈশ্বরের নাচের মুদ্রা। কোনো অন্তরের শতবর্ষ যায়, কোনো অন্তরের ভাঙা ঘড়ি ভেঙে পড়ে এখানে। হাওয়ার মালা বদল হলে পাগলা হাওয়া এখানেই এসে বাঁধে ঘর। তবু ভাত এক হারানো গিরিবাজ, ডিগবাজি যার অকালের ধর্ম। জগৎ কানা জগৎ দেখে ভাতের থালায় আর ভাতগুলো তাকিয়ে থাকে জুয়া খেলায়...

তাইতো পৃথিবীর শরীরে চাকা চাকা ভাতের থালা। কেউ কেউ বলে ওটা পৃথিবীর পদ্মচাকার রোগ। ভাতের থালা ঘুমিয়ে পড়লে পৃথিবী তাজা ঘোড়ার মতো ধড়ফড় করে ওঠে। তাইতো ধড়ফড় করে উঠেছে প্রাণের কাঁচা মাংস। ক্ষুধার্ত ভাত, তোমার শাদা দাঁতগুলোকে প্রশ্ন কর, কী হবে এই প্রাণের? চিরকাল ভাতের মালা পরে থাকা প্রাণ এক দুর্ভাগ্যের সম্রাট। আমি কি কখনো দেখেছি প্রাণ? কী তার রূপ? তবে কি টুকরো টুকরো ভাতের ভেতর খণ্ডিত হয়ে আছে আমার প্রাণ? কতকাল ভাতের গায়ে রেখেছি হাত অথচ বুঝি না তো কোনোদিন ক্ষুধার্ত আঙুলগুলোর ছোট বড় হওয়ার রহস্য? কী হবে এই হাতের? ভাতের কাচে কাটা হাতের রেখাগুলো ছলনার মানচিত্র।

চৌত্রিশ

প্রকৃত অন্ধকার ভেঙে গেলে ভাতগুলো ক্রীতদাস হয়ে ওঠে... আর এভাবেই ভাতগুলো ভূখণ্ডের কপালে ছুড়তে থাকে বিভীষিকাময় তীরধনুক। ক্রীতদাস ভাতের কি আর কোনো ভূখণ্ড আছে? এই ভাবনায় পৃথিবীর উল্টো পৃষ্ঠায় কিছু থালা শূন্যের সাথে পাল্লা দিয়ে মেতে ওঠে। তাইতো কোনো এক কুলনাশা থালার ওপর ভাতগুলো ভুল ঘোড়ার মতো শুয়ে থাকে। আর এভাবেই পৃথিবীর পাঁজরে ঘটেছিল অদ্ভুত এক ঘটনা। কী ঘটেছিল ভাতের কপালে? ক্রীতদাস ভাতের কপালে লেখা ছিল বিপদের গান, আর সেই বিপদের ভেতর ভেসে ওঠা যতসব দুধ কলা সবই ছিল সত্যের মতো লীলাময়ী। তবে কি দুর্ভিক্ষের চাতুরি ছাড়া ভাতের কপালে আর কিছুই নেই? কতকাল ভাতগুলো অন্ধকারে বেড়ে ওঠা লোহার ওপর মাথা ঠুকে মরল তবুও লোহার মর্ম বাজল না। কবে আর বেজে ওঠে লোহার মর্ম? এই মর্মে ভাতের ঘড়িতে শুধু বিপদই বাজে আর সে ঘড়ির সময়গুলো ফসকে যাওয়া ক্ষুধার মতো বলবান হয়ে ওঠে। তাইতো দেখা যায় মহাভারতের ভাতগুলো বিপদের টুপি পায়ে হেঁটে আসছে কুলনাশার থালার দিকে। তবে কি কুলনাশার থালাই ভাতের ভূখণ্ড? যুগে যুগে ভূখণ্ডের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ভাতগুলো এসেছিল আমাদের থালায়? আর কোনো এক আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আমাদের থালাগুলো গিয়েছিল কাণ্ডকারখানার দিকে? ক্রীতদাস ভাতগুলো আমাদের ক্ষুধার কাছে ধরেছে ভূখণ্ডের বাজি, আর আমরা সহসাই দেখে নিতে পেরেছি ক্ষুধার প্রান্ত থেকে থালার দূরত্ব। আর সে দূরত্বের ভেতর বাস করে এক অনন্ত সময়, যার ভেতর ক্রীতদাস ভাতগুলো রক্ত ছড়ায় ঘর বাঁধে। এমনকি শেষ পচনের আগে ক্ষুধার বিছানায় চাঁদ বুকে শুয়ে থাকে ক্রীতদাসী ভাত...

পঁয়ত্রিশ

ভাতের চোখ ফোটা নিয়ে বেড়ে গেল বিরোধ। আর এই বিরোধের চিহ্ন পাওয়া গেল সেসব ভাতের প্রাণের ভেতর, যারা জন্মলগ্ন থেকেই ছিল মৃতদের পাহারাদার। ভাতের চোখে ফুটে আছে মৃতদের আয়ু আর প্রতিটি মৃত চোখের ওপর হেঁটে যাচ্ছে ভাতের নজরদারী। তাইতো ভাতের গির্জায় দেখা যায় ভাতগুলো নিজেই নিজের প্রার্থনা। তবে কি দীর্ঘ প্রার্থনা শেষে ফোটে ভাতের চোখ? নাকি মৃত মানুষের নিস্তেজ চোখের ওপর ওরা করেছিল লোভ? এমন দেহভেদী প্রশ্নের মুখে ভাতের পাপগুলো লাফায়, তবে কি পৃথিবীর ঘামের ভেতর বেড়ে ওঠে ভাতের পাপ? ভাতের পুরোহিত জানে না একথার উত্তর। তাইতো প্রতিটি ভাত দৌড়ে যায় অন্ধ আয়ুর দিকে, অন্ধ আয়ুর ভেতর ফুটে থাকা শর্ষে ফুলে খুঁজে পায় প্রকৃত পাপ। গলাভরা পাপ না হলে কি আর ভাতের চোখ ফোটে? তাইতো দিনরাত ভাতগুলো মৃত মানুষের চোখের চারপাশে করছে খেলা। মৃত মানুষের চোখের তারায় ঢালছে ভালোবাসা প্রেম গন্ধ আরো কত কী! নিস্তেজ চোখের ভেতর ছেড়ে দিচ্ছে ট্রেন, ধারাল চাকু, দ্রুতগামী পোকা। আর এভাবেই ভাতের চোখে লাগে বাদল দিনের হাওয়া, যেভাবে মৃত মানুষের চোখে লেগেছিল সে হাওয়ার তীর ধনুক। আর এই মর্মে কিছু কিছু ভাত আজো দাবি করে আছে পৃথিবীতে ডেকে ওঠা সমস্ত মেঘের শব্দই তাদের চোখ ফোটার শব্দ...

ছত্রিশ

ভাতের মা কাঁদতে জানে না— এই মর্মে পৃথিবীতে যত বাঁশি বেজেছিল তার সবই নাকি ভাতের মায়ের কান্না। তাইতো প্রতিটি কদম ফুলের ঘরে ভাতের মা ঘুমিয়ে থাকে। তোমাকে কতবার বলেছি ভাতের মায়ের ঘুম ভাঙলে আমাদের পাতে নেমে আসবে অন্ধকার, তুমি তা আর বুঝলে না অযথায় ভাতের গলা টিপে দিলে। সূর্য উঠে উঠে আমাদের চারকোনায় জমে ওঠে ভাতের সৎকার, তোমাকে একবার ভাত বিহারের গল্প বলেছিলাম, তা শুনে তুমি কেঁদেছিলে আর ভাতের ঘোড়া তোমার কান্না শুনে হেসে উঠেছিল। আমাদের জীবনের কাছে এসে কতদূর হেঁটে গেছে ভাতের জীবন? ভেবে দেখ বন্ধু, ভাত আমাদের প্রাণের রাজা! ভাতের ঘর নেই, বাড়ি নেই এমনকি ভাতের আঁতুড় ঘরে কোনো শিশুর কান্না নেই। তবুও তোমার চোখের জল পৃথিবীতে এসে ভালোবাসা শিখে নিল। পৃথিবীর ভালোবাসাগুলো ঘুমিয়ে পড়া ভাতের স্বপ্নের মতো শাদা। আর ভাতের মায়ের কাছে জমা আছে আমাদের আয়ুর মানচিত্র। পার যদি দেখে এসো তোমার মৃত্যুর আগের দিন, সেখানে আসক্তির কাপড় খুলে দাঁড়িয়ে আছে কিছু ভাত, তবে কি মৃত্যুর ডাকবাক্সে ভাতের কোনো চিঠি এসেছিল? আর কেনইবা পৃথিবীর ভালোবাসার দিকে ভাতের মা কান পেতে আছে...

সাঁইত্রিশ

এইমাত্র ভাতের ইন্দ্রজাল খুলে দেখলাম সেখানে কোনো মহাকাল নেই, সেখানে অবিরত লেগে আছে ভাতবর্ষের আদিমতম রাত। আর প্রতিটি মানুষের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ফুটে আছে একটিমাত্র ভাতফুল। আর সে ফুলের গন্ধ এমনি এক কথা বলে যেখানে তুমি একটা ভাত, আমি একটা ভাত, আর পৃথিবী সে ভাতের হাঁড়ি। তবে কি ভাতের মতো কোনো এক থালার ওপর আমরা অবিরত ঘুরছি? অগতির গতি জানে ভাতের অবতার। তাইতো আমাদের রক্তের ভেতর ভেসে যায় তুলসীপাতার রহস্য। ভাতের জোনাকি কোনোদিন কোনো আলো দেখেনি, সমস্ত রক্ত আলো দেখেছে ভাতের সিন্ধুকে। তাইতো আমাদের খুলে দেয়া জীবনের কার্নিশে মরে পড়ে আছে বিপন্ন ভাতের জোনাকি। তবে কি আমাদের পূর্বপুরুষের কেউ একজন ভাত ছিলেন আর কতটা আলোকবর্ষ পেরুলে আমরাও হব ভাতের জোনাকি? ভাতের জোনাকি পাগলের ঈশ্বর, সেই ঈশ্বরের কাছে জেনেছি যতসব আত্মকথা। আত্মার নিরন্তর পথে যেতে যেতে হারিয়ে যাওয়া পৃথিবীর যখন যেখানে ঢুকেছি সেখানেই ভাতের কুরুক্ষেত্র। শুধু কি তাই, সমস্ত শাস্ত্র-পুস্তকের ভেতর ভাতগুলো লুকিয়ে আছে বর্ণমালার ভঙ্গিতে। তাইতো তোমার মুখের গোপন স্তরে জেগে থাকা ভাতের জীবাশ্ম মৃত অবতারের মতো ঘুমিয়ে আছে। তাইতো আমার রক্তের ভেতর ভাতের জোনাকি ডাকছে মৃতগ্রহের ডাক। আর এভাবেই জানা গেল পৃথিবীর বুকে জমে থাকা সমস্ত অন্ধকারের ভাষা, আমাদের প্রাণ এক ভাতের ইন্দ্রজাল...

আটত্রিশ

ভাতের সখির চুল বেঁধে দিয়েছিলাম আমি। আর চুল বাঁধতে বাঁধতে দেখেছিলাম প্রতিটি চুলের সময় সাধনা অদ্ভুত রকমের কালো। পৃথিবীতে যত কালো রেখা বয়ে গেছে তার প্রকৃত কৌশল জেগে আছে ভাতের চুলের ভেতর। পঞ্চমী ক্ষুধায় লেগেছে পোকা— ভাতের চুলে কোনো গন্ধ নেই কারণ প্রতিটি ফুলজন্মের বিপরীতে দাঁড়িয়ে থাকে ভাতের মৃত্যু। তিনকোনা মৃত্যু এড়াতে ভাতের খোঁপায় বাসা বাঁধে কালো কালো সময়। তাইতো ভাতের চুলগুলো এমন এক কালের হাওয়ায় দোলে যেখানে প্রতিটি ভাতের গায়ে বেড়ে চলেছে মর্মের লোম। আর সেসব লোমের ডগায় জেগে আছে এক অদ্ভুত ভাষা। কে আর শোনে এমন কেশবতী ভাতের গল্প; পৃথিবীর প্রথম বেড়াল যেদিন ভাঙা সময়ের প্রথম প্রহরে ভাত খেল, সেদিনই ভাতগুলো ওই বেড়ালের কাছে বলেছিল তাদের চুলের গল্প। কী ছিল সেই গল্পের ভেতর? মরা বেড়ালের আয়ু ঘুরে বেড়ায় ষষ্ঠী ভাতের থানে, আর কিছু কিছু ভাত হেঁটে যায় ডুবে যাওয়া সূর্যের দিকে। সূর্য ডুবে গেলে সপ্তমী ক্ষুধার উত্থান, তাইতো দেখা গেল সূর্যের দিকে হাঁটতে থাকা প্রতিটি ভাতের সময়জ্ঞান আলাদা আলাদা। কোনো ভাতের মাথার ওপর ভোর নেমেছে তো কোনো এক ভাতের বুকে দুপুর। আর যে ভাতটির মাথায় পৃথিবী ভাঙল, তার মাথায় নেমে গেল সন্ধ্যা। আর এভাবেই একেক ভাতের ঘড়িতে একেক সময় বাজে। তবে কি পৃথিবীতে নেমে আসা দুঃসময় এড়াতে ভাতের ঘড়িগুলো এমন ভূমিকা নিল? তবে কি আমাদের ঘড়িগুলো সুসময় জানে না? পৃথিবীতে না বেজে ওঠা সময়গুলো ভাতের চুলের ভেতর আটকা পড়ে আছে আর এভাবেই কোনো এক আগুনের যজ্ঞে পুড়ে গেছে ভাতের চুল, আমাদের অপ্রকাশিত সময়...

কোনো এক চক্র থেকে ছিটকে পড়া ভাতের সর্বনাশ ধীরে ধীরে বড় হয় পৃথিবীতে। আর ভাতচক্রের হাওয়া এসে লাগে আয়ুর পাথরে। তোমার ঘুমের ভেতর ছুটে চলা ভাতের রক্ত কোনোদিন রঙ পেল না। তাইতো দেখা যায় পরিত্যক্ত ভাতের কেউ কেউ আমাদের রক্তের প্রকৃত দাবিদার। তবে কি রক্তের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বড় হয় ভাতের সর্বনাশ? কাকে আর বলা যায় বন্ধু? মৃত্যু ক্ষয় করে তুমি শুয়ে আছ মাটির রক্তের ওপর, তুমিই শোনো ভাতচক্রের আদি গল্প...

আমরা তো ভাতের পুত্র, আমাদের দেহের ভেতর ফুটে আছে ভাতের নক্ষত্র। আর এমনিভাবেই কত সত্য মাথায় করে পৃথিবীতে নেমে আসে ভাতের হাওয়া। তুমি কি সেই সংকেতের প্রকৃত ভেদ জানতে পেরেছিলে? পৃথিবীর সকল ভ্রান্তি যেদিন ভাতের পিঠে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল সেদিনই লেগেছিল বেদ বিধির যুদ্ধ। কী এমন জেগে আছে ভাতচক্রের প্রথম প্রহরে, যেখানে ভাতগুলো দাবি করে আছে প্রকৃত নিরাকারের দাবি। যে ভাত থালার ওপর বস্তুরূপে বিরাজ করছিল সেই ভাতই কিনা দেহের ভেতর হয়ে গেল অনন্ত ভাব। আর এভাবেই নাকি দেহান্তর হতে হতে ভাতের পরম আয়ু চলে গেছে অবিনাশী শক্তির দিকে। তবে কি এ দেহ ভাতের ডাকবাক্স, তবে কি এ জীবন ভাতের আকার? কত সব প্রশ্ন বুকে নিয়ে মাটির গভীরে শুয়ে আছ বন্ধু আর আমাদের জীবন মরণের মাঝামাঝি চলছে ভাতচক্রের খেলা, তাইতো পৃথিবীর সর্বত্রই শোনা যায় ভাতের গান বাজনা আর এমনি করে তুমিও কি শোনোনি ভাতের উপকথা, যে কথার বাঁকে আকার নিরাকার একাকার হয়ে আছে...

তখন আর কত হবে? ধরুন পৃথিবীর ভোররাতে চরিতেছে যজ্ঞের বেড়াল। আর গভীর অন্ধকারে ঘুমিয়ে পড়েছিল পাড়ার নিরর্থক ভাতটি আর এভাবেই যখন আরো একটি ভাত ঘুমিয়ে পড়া ভাতটির কাছে গেল তখন ঘটল ভাতযজ্ঞের অদ্ভুত কাণ্ড! ঘোর অন্ধকারের ভেতর দেখা গেল ওই ভাতের মাথায় দুপুরের সূর্য উঠে আছে। শুধু কি তাই, ভাতপাড়ার প্রতিটি ভাতের কপালে জেগে আছে নির্ভেজাল বেলা অবেলা। ধরুন ভাতের রাস্তায় বিস্ময়কর ভঙ্গিতে হেঁটে যাচ্ছে পাঁচজন ভাত, যাদের প্রত্যেকেরই বেলাগুলো ধারণ করে আছে ভিন্ন ভিন্ন রূপ। আর প্রথম ভাতটি যখন জন্ম আর প্রার্থনার সন্ধান করছিল তখন ভাতের দেবালয়ে লেগেছিল আগুন। দ্বিতীয় ভাতটি যাচ্ছিল ভাতের স্কুলে কারণ তখন ছিল তার ভোর। আর ভাতটি যখন স্কুলে পৌঁছেছিল তখন ভাতের পণ্ডিতের লেগেছিল রাত। আজন্ম পাঠের আশায় ভাতটি সারারাত স্কুলে বসে থাকল... এবার ভাতের পণ্ডিত যখন পুনরায় স্কুলে ফিরে এল তখন ভাতটি চলে গেল প্রাণের কৌশলের দিকে। ভাতের রাস্তায় তৃতীয় ও চতুর্থ ভাতটি হাঁটছিল খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কারণ তাদের অন্তরে ফুটেছিল জগতের কাঁটা। তাদের একজন ছিল দেবালয়ের ঝাড়ুদার, আরেকজন ছিল অনাগত বেদনার পাহারাদার। আর এসব ভাতের সময় সাধনা এতটাই বেড়ালগামী যে, ধাপে ধাপে তাদের বেলাগুলো আলগা হয়ে ওঠে। ভাতের রাস্তায় পঞ্চম ভাতটির গায়ে জাগে পঞ্চমী চাঁদের তামাশা, তার বেলায় দেখা যায় শুধু জন্মের ছাপ, মৃত্যুর ছাপ, তার অবেলায় দাঁড়িয়ে থাকে যজ্ঞের বেড়াল...

একচল্লিশ

মদ্যখানার দবির সরকার কোনো এক মৃত্যুর মানিক। মদ তো ভাতের মমিরস। পৃথিবী যখন মরে যায় তখনো জেগে থাকে মদ্যখানার চারকোনা, তখনো অনাগত মৃত্যুর চোখে গলতে থাকে ভাতের মৃগনাভি। কে ওই মৃত্যুর মানিক? কোথা থেকে এসে কোথায় চলে যায়? ভাতের রাশিফল খুঁজে মেলে না তার উত্তর। এই তো মদ্যখানার পথে পথে জমে আছে তেঁতুল গাছের ছায়া আর সেই ছায়ার ভেতর ভাতের সাধক বহুদিন কাঁদছে পাখি ক্ষরণের কান্না। মদ্যখানায় তো কোনো উঠোন নেই অথচ সেখানেই দেখা যায় সাপুড়ে পৃথিবীর ভাঙা আটচালা। পৃথিবীর কোথাও কি আর এমনভাবে জেগে থাকে ভাতের আটচালা? তাইতো মদ্যখানাই ভাতের বারামখানা...

তাইতো ভাতগুলো শতবর্ষ পচে পচে পানশালার অন্তরে মোচড় দিয়ে ওঠে। আর গোলাপি মৃত্যুর নেশায় ভাতের মমিগুলো শোনে মানব অন্তরের নিরন্তর আজান। আর এভাবেই মহাকালের বাকলছেঁড়া শব্দে ভাতের পিরামিড খণ্ড খণ্ড হয়ে যায় পানপাত্রের ভূখণ্ডে। মানব অন্তরে কে হেঁটে যায়? কার পায়ের শব্দ? ভাতের নাকি ডাকাতি মরণ? মানব অন্তর এক উৎকৃষ্ট মদের নাম, চিরকাল পানশালার ভাতগুলো পান করে তার মধু। তাইতো প্রথম পানপাত্রের ভাতগুলোর চোখ ফোটে বেড়ালছানার মতো, সে চোখ একবার হাসে বহুবার কাঁদে... দ্বিতীয় পানপাত্রের ভাতগুলো বলে— সময় আর জীবন ওরা যমজ ভাইবোন, ওরা বেঁচে থাকে পৃথিবীর সমান। তৃতীয় পানপাত্রের ভাতগুলো থাকে নির্বাক কেননা তারা জেনেছিল শতবাকের নমুনা। আর এভাবেই বহু বহু গণনা শেষে, শেষ পানপাত্রের ভাতগুলো মানব অন্তরের কাছে এসে বলে যায়, জীবন হতে মরণ উত্তম! মানুষ বেঁচে থাকে গণনায় মরে থাকে নিরন্তর...

সাধুর হাটে সর্বনাশ হয়েছে, ভাতের বোষ্টুমি ভুলে গেছে সব গান। তাইতো ভাতের সাধন ভজন কোনো এক অন্ধকারের কাছে এসে নতজানু হয় আর তাদের আত্মার কাঁটাগুলো উপড়ে ফেলে। আর সেসব ভাতেরা যারা কোনোদিন হাঁটতে জানে না, তারাও হাঁটতে শুরু করেছে কোনো এক চাঁদের দিকে... ভাতের চাঁদ কোনো প্রশ্ন জানে না, চিরকাল সকল প্রশ্নের মুখে উদ্ভ্রান্ত উত্তর হয়ে থাকে। তাইতো কোনো কোনো ভাত তাকিয়ে থাকে সূর্যের দিকে, আর সূর্যই নাকি এ ভূগোলের আদি বাউল। কই দেখিনি তো কোনোদিন সূর্যের চুল, আমাদের করুণার কাছে এসে জমা হওয়া প্রতিটি পাথরের নাম তো আলো? তবে কি পৃথিবীতে কোনোদিন আলো নেমে আসেনি? সবই সূর্যবাউলের চুল? তাইতো দেখা যায় সূর্যের মাথায় বেড়ে যাওয়া চুলগুলো ভাতের মাথায় এসে ঠেকে। ভাতের তিনকোনা মাথায় লুকিয়ে আছে চারকোনা সূর্য, সূর্যের চারকোনা মাথায় লুকিয়ে আছে ভাত বোষ্টুমির চুল। আর সব ভুলে গিয়ে ভাতের বোষ্টুমি ঘুমিয়ে আছে জীবাত্মার ঘরে। সর্বনাশ আরো আছে, মরম আত্মার ঘরে বসে ভাত খেয়েছে পৃথিবী। তাইতো দেখা যায় কিছু কিছু ভাত আমাদের থালার ওপর বাজায় মৃত্যুর খঞ্জনি। কার মৃত্যু জানে ভাতের খঞ্জনি? পৃথিবীর নাকি সূর্যের? সাধুর হাটের এক কোনায় বসে বসে কাঁদে ভাতের একতারা। তাইতো ভাতের প্রাণে বেড়েছে মর্মের জ্বালা, আর এমনি এক তুফানের ওপর ভর করে সাধুর হাটের সকল ভাত জমা হয়ে গেল পৃথিবীর জীবাত্মার ভেতর। কবে ফিরবে হারিয়ে যাওয়া ভাত বোষ্টুমির গান? বাউল ভাতগুলো তাইতো আমাদের আত্মার ভেতর, ক্ষুধার ভেতর চিরকাল খালি পায়ে হাঁটে। বলে রাখলাম ভাত বোষ্টুমি গান ফিরে এলে আমাদের থালা ছেড়ে চলে যাবে ভাতের সাধুরা...

জীবন মুখে ফুটল কত গন্ধমের ফুল। আর ভাতের গায়ে আমাদের নাম লেখা ছিল বলে সে গায়ে খুঁজেছি পাখি বিবাদের দাগ। না, খুঁজে পাওয়া গেল না ভাতের প্রকৃত বাসনার কথা। কেবল ভাতের অন্তর ছুঁয়ে জানা গেল মানব অন্তরে আছে এক চরের মাটি আর সেই মাটি দখল করে আছে ভাতের লাঠিয়াল। গতি জানে না এমন এক ভাতের পিঠে লেখা ছিল জীবনের গতিবিধি। কোনো এক জন্মের গূঢ়তম অন্ধকারে ফুটে গেল ভাতের পাখা। জন্মের জলে ভেসে থাকা ভাতের পাখা দেখে আমরা কেউ কেউ আঁতকে উঠেছিলাম, তবে কি দেহের ভেতর ভাতগুলো মাজরা পোকা হয়ে যাবে? তাইতো আমাদের লাল নীল রক্তের ভেতর উঠেছে কত কিসের আটচালা। আর যারা যারা গরম ভাতের অবিশ্বাসে পুড়েছিল তাদের দেখা গিয়েছিল ভাত দখলের চরে। ঠিক এই অভিজ্ঞানে পৃথিবীর ভাঙা পায়ে আমরা কত হেঁটেছি অথচ ভাঙা পৃথিবীর বিপরীতে আমাদের অন্তর হয়েছে এক চরের মহল। আর এভাবেই চিরকাল আমরা দখল করেছি ভাতের চর আর ভাত দখল করেছে আমাদের অন্তরের চর।

এই তবে পাখি হত্যার রহস্য? এই তবে সন্দেহের ত্রিভুজ? অন্তরের নিরন্তর ধড়ফড়ানিই তবে ভাতের চর দখলের ডঙ্কা! ওই তো ভাতের লাঠিয়াল দেহের চতুষ্কোণে দাপাদাপি করছে আর আমাদের পরম আয়ু গলে পড়ছে কোনো এক সত্তার মুখে। তবে কি ভাতের দখলে আছে জীবনের সমস্ত চরের মাটি? কী আছে সেই মাঠির ভেতর? সোনার বাটি নাকি দুধে ভেজা শেকড়? এ দেহের ভেতর ঘটে যাওয়া যতসব মরণ সবটুকুই হয়েছে ভাতের বেড়াল। আর ভাতের লাঠিয়াল কেনইবা জগৎ বেচে দখল করে মানব অন্তর। এমন ভাতের দিনে জীবনের ঠাঁই ঠোকর আর খুঁজে পাওয়া যায় না। তবুও পৃথিবীর আনাচে কানাচে ভাঙা জগতের দৌড়। তবুও রাজা বাদশার দিনে ভাতের মাথায় মুকুট। ভাতের ঘরে সত্য ভেঙেছে কে? তবে কি প্রকৃত রাজার নাম ভাত? জগৎ জানে না জগৎখোঁড়া মেয়েটির স্বামীর নাম ভাঁপ ওঠা ভাত...

চুয়াল্লিশ

মেঘের অন্তরে এত ভাত জমে আছে দেখি না তো কোনোদিন। ওই না বাঁশি বাজল আর ভাতগুলো অন্তর থেকে ছেড়ে দিল পানি। তাইতো এ জীবনে যতবার উঠেছি ভাতের সিঁড়ি বেয়ে ততবার ভিজে গেছে পা। তাইতো প্রাচ্যের পাগুলো এত করুণ। বিশ্বাস করুন, এই অনাহূত প্রাচ্যের একমাত্র ঈশ্বরের নাম ভাত। যার প্রার্থনার কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই, নেই দিব্য আর দৈবের কোনো দ্বন্দ্ব। কেবল প্রাণের লতা বেয়ে ওরা একবার ওঠে আরেকবার নামে। শুধু কি তাই, মরার পিঁড়িতে বসে ভাতগুলো কখনো মেঘ হয় কখনো বৃষ্টি, তাইতো কোনো কোনো মৃত্যুর ভেতর দেখা যায় ভাতের শাদা শাদা পোকা। তবে কি পৃথিবীর সকল হাঁড়ির ভেতর থেকে গেল আসমান জমিনের প্রার্থনা। তাইতো দেখা যায় নিশুতি অন্ধকার ভেঙে পৃথিবী দাঁড়িয়েছে প্রাচ্যের দিকে আর পৃথিবীর মাথা নিচু হতে হতে ভেঙে যাচ্ছে বিগত দিনের সকল প্রার্থনার অক্ষর।

বুঝি না তো কোনোদিন ভাতের এত জাদু, প্রাচ্যের হাঁড়ির ভেতর ঈশ্বরের পোনাগুলো আগুন জলে হয়েছিল অবতার? এ মাটির ভেতরই তবে ভাতের প্রকৃত কীর্তন? ভাতের দিকে সূর্য প্রতিদিন তাকিয়ে থাকে, কী এমন যোগসাধন জেগে আছে ভাত আর সূর্যের? আমরা জেনেছি ক্ষুধা, সূর্য জেনেছে রক্ত, আমরা শিখেছি প্রার্থনা, পৃথিবী শিখেছে ভাত। তবে তো সর্বনাশ! আমাদের ক্ষুধার ভেতর পুড়ে গেছে ঈশ্বরের আয়ু, তবে তো প্রাচ্যের আকাশে জেগে থাকা যতসব নক্ষত্র সবই এক একটা ভাত। আমরা খুঁজেছি, খুঁজতে খুঁজতে ব্যাকুল হয়েছি আকার সাকার অথচ এই প্রাণের কাছে জেগে আছে পৃথিবীর কপাল আর কারা কারা যেন ভাতের নামে পাঠ করছে সে কপালের গুহাচিত্র। কে পাঠ করে ভাতের পাদলিপি? প্রাচ্যের মাটি নাকি পৃথিবীর আয়ু? আকার কিংবা সাকার— নেই কোনো চিহ্ন তবুও ভাত যেন এক সাধকের সাধক...

পঁয়তাল্লিশ

আজ ভাতের মৃত্যুবার। আজই কাঙালের আকাশে নেমে আসবে নিরন্তর ভাত। আজ সবকিছু শাদা হয়ে যাবে। কালো ইঁদুর, লাল বাতাস, এমনকি মানুষের অন্তর, ভাতের লালায় হয়ে যাবে শাদা। তোমরা কেউ কি শোনোনি বাঁশিমৃত্যুর পূর্বক্ষণে; কেউ কি জানোনি বেড়াল মৃত্যুর পরক্ষণে; ওই একবারই প্রাচ্যের মাটিতে নামে ভাতের মৃত্যুবার। কত আর বলি— মানব অন্তর আমি তোমার প্রথম ক্ষুধার শেষ ভাত। এই নাও ভাতের মানচিত্র আর জেনে নাও অস্তিত্বরেখায় তুমি এক নাই নাই খেলা? তোমার মস্তকই কি তুমি? তোমার হাত পা অন্তর? কোথায় তোমাকে পাওয়া যায়, দেহের লোমকূপে নাকি দাঁতের গোড়ালি? কোথায় থাকে তোমার অস্তিত্ব? খুঁজে পাও কি ক্ষুধার দাস? অবশেষে কে তুমি? কী তোমার নাম? প্রেমের ভেতর, ক্ষুধার ভেতর বলতে পার, তোমার দেহের ভেতর কোথায় তুমি থাক? জানি ছায়ার টানে দ্বিখণ্ডিত মানবের দেহ। তুমি তো ভূখণ্ডের অন্তর? ভাতের পতাকা হাতে চিরকাল দিয়ে গেলে দৌড়। কার হাত? কার পতাকা? কার পথে কারইবা দৌড় দিয়েছ মানব অন্তর? ভাত এসেছিল তোমার কাছে, তোমার প্রাণের কাছে ঝুলিতেছে ভাতের বায়বীয় চাবি, আর এভাবেই একদিন যখন খুলে গেলে জীবনের নিরন্তর হাওয়ায়, তখন কি একবারও জানোনি উদ্বাস্তু রক্তের ভেতর এই পৃথিবীতে তুমি কেবল একটা ভাত ছিলে।

ছেচল্লিশ

এই যে কানার হাটে জ্বলছে বাতি এ আলো ভাতের সদিচ্ছা। এই যে প্রাণের হাটে বসেছে অন্ধকার এ আঁধার ভাতের চোখ বুজে থাকা। আসলে কি প্রাণের ভেতর কোনো হাট বসেছিল? আসলে কি পৃথিবীতে কোনোদিন কোনো আলো জ্বলেছিল? সকল দৃশ্যের গভীরে অদৃশ্য নুন ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না। তবে কি এই ভুবনের সকল দৃশ্যই ভাতের অদৃশ্য রূপায়ণ? পাখির ঘরে এমনই এক ঘন্টা বেজে গেল। আর ঘন্টা থেকে বেরিয়ে এল সেসব ভাতের কণ্ঠ যারা আলোকে ভাবত দস্যু, ছায়াকে ভাবত মিথ্যার রঙ। তবে কি মানুষের ছায়াটাও ভাতের সদিচ্ছা? দেহের কোন অন্দর থেকে বেরিয়ে আসে ছায়া? পাখিগুলো সারাদিন বসে বসে ভাবে। তবে কি পাখির খাতায় ভাতের নাম বদলে গেছে? পাখির ঘরে কী রূপে বিরাজ করে ভাতের ইচ্ছা? সে রূপের কাছে গিয়ে দেখা গেল সূর্যের কাছাকাছি ভাত ছাড়া আর কেউ নেই।

এই মর্মে বহুদিন আগে কিংবা এক্ষুনি এক পাকুড় গাছের সাথে আমার দেখা হলো। গাছটি বসে বসে ভাত খাচ্ছিল। গাছের ভাত খাওয়া দেখে বিস্মিত হওয়ার কিছুই ছিল না। গাছটি বলছিল আমরা এভাবেই খাই। মাটি বলছিল আমরা এভাবেই ঘুমাই, আর মানব অন্তর দেখছিল সূর্য এসে গাছটির গোড়ায় দিয়ে গেল পূজা, ভাত এসে সূর্যের মুখে খেয়ে গেল চুমু। তখন মানব অন্তরের সাথে এসে দাঁড়াল বড় পাপ আর ছোট পাপের বংশধর। পাপগুলো এসে বলল, আমরা ভাত খাব; ভাতগুলো এসে বলল, আমরাও পাপ খাব। এবার বড় পাপটি ছোট পাপকে ভীষণ মারল। আর ছোট পাপটি যখন কেঁদে উঠল, গাছটি তখন হেসে উঠল, বেড়ে গেল ভাত আর সূর্যের সখ্য। আমি তখন এ দেহের পাঁচকোনা ছুঁয়ে দেখি কোথাও কোনো পাঁচটি ডাল নেই, পাতা নেই, নেই কোনো শেকড়। তাইতো মানবের প্রথম প্রহরের ভাতগুলো দ্বিতীয় প্রহরে মরে যায়, তাইতো মানবের লাগে বারবার ক্ষুধা আর এভাবেই গাছের অন্তর হতে ভাতগুলো বলতে লাগল তাদের জীবনের তিন প্রহরের কথা। ভাতজন্মের আগে মাটির অন্তরে আমরা প্রতারণা হয়ে ছিলাম, ভাতজন্মের পরে মানব অন্তরে আমরা মিথ্যা হয়ে ছিলাম, ভাতমৃত্যুর পরে গাছের অন্তরে আমরা সত্য হয়ে আছি...

সাতচল্লিশ

আজ একটা সমাবেশ আছে, প্রাচ্যের সকল ভাতের থালার সমাবেশ। কী ঘটবে এই সমাবেশে? তাইতো ভাতগুলো উদ্বিগ্ন ছুরির নিচে হা হুতাশ করছে। তাইতো ভাতগুলো করুণার শাদা কাপড় পরে হাঁটতে শুরু করেছে ওই সমাবেশের দিকে। ভেবে দেখ ক্ষুধার্ত প্রাচ্যের আকাশ; আজ কিন্তু কোনো থালা নেই, ভেবে দেখ তোমার মানচিত্রে প্রতিটি রেখার নাম কিন্তু করুণা। আরো একবার ভেবে দেখ সমবেত থালাগুলো তোমার ঘরে এবার কী রূপে ফিরে আসে। তবে কি এই প্রাণ এক করুণার পাহাড়? যেখানে নিরন্তর ভাঙছে বিপদের ডিম। এই তো আমাদের ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছে নিরুপায় ভাতগুলো, কোনো এক জনমে ভাতেরা নাকি সাপের ডিম হবে। তাইতো প্রাচ্যের হাঁড়িগুলো তুমুল অন্ধকারে কেঁদে মরে। তোমরা কি কেউ শুনতে পাও হাঁড়িগুলোর করুণ দায়, বিপদ নেমেছে হাঁড়ির ভূগর্ভে; আর এমনি এক দিনে প্রতিটি ভাতের গলায় বাঁধা হয়েছে বিপদের ঘন্টা। তবে কি ভাতের উপত্যকায় এসে লাগা সমস্ত বাতাস ছিল বিপদের জাতভাই। তবে কি আমাদের জন্মমৃত্যুর ভেতর ঢুকেছিল করুণার শাদা শাদা সাপ। আমাদের সমস্ত প্রশ্নগুলো বিপদে আছে, আমাদের সমস্ত উত্তরগুলো বিপদের মাথা হয়ে গিয়েছে। অবশেষে তবে কী জানা গেল? ভাতের মহাকাল, রক্তের দৌরাত্ম্য, এমনকি প্রাচ্যের ফুল পাখি সবই করুণা? আজ আরো একটা সমাবেশ আছে, কালো মাটির সমাবেশ, কেননা এই ক্ষুধার্ত মাটির মুখের কাছে সকল প্রাচ্যপুত্রকে জমা রেখে ভাতগুলো নাকি চলে গেছে বিপদহীন জনমের দিকে...

পৃথিবীর আলো অন্ধকার খুঁজে খুঁজে অবশেষে একটা ভুল জনগোষ্ঠীর সন্ধান পাওয়া গেল। যারা জন্মের আগে খেয়েছে মানচিত্র, মৃত্যুর পরে খেয়েছে ভুলভাত। কোন তালশাঁসের ভেতর এই জনগোষ্ঠীর বাস? কী তার ভূখণ্ডের রঙ? সেখানে কি কোনো মাটি আছে? সেখানে কি কোনো লতাপাতা ফড়িং আছে? মেলেনি এসবের কোনো সন্ধান। অবশেষে জানা গেল ওই জনগোষ্ঠীর আঁতুড় ঘর থেকে বেঁচে থাকা পর্যন্ত জমা হয়ে আছে কিছু ভুলভাত। আর জানা গেল তাদের ভুল নিশ্বাসের খবর। যে নিশ্বাস দিয়ে কল্যাণের তরবারি আর সৌভাগ্যের হাতুড়ি বেরিয়ে আসে। এই তবে বেঁচে থাকা? মহাশূন্যের পাখি জানে মৃত্যুর বয়স। অথচ ওই নিশ্বাসের সাথে বাতাসের কোনো যোগসাধন নেই, কেবল নিশ্বাসের হাত পাগুলো মাখে জন্মান্তরের তাজা রক্ত। তাইতো ভুল জনগোষ্ঠীর চোখ মুখ ভুলভাতের মতো অমীমাংসিত।

কোন মাটির জঠরে এসব বেভুল ভাতের জন্ম? আর পৃথিবীর কোথায় বা জেগে আছে এমন ভুলমাটির ভূখণ্ড? ঠিক এসব গতিবিধির সন্ধানে ভোররাতের বেড়ালগুলো ভুল হয়ে বসে আছে। ভুল ভূখণ্ডের ভোররাতগুলো কেমন ছিল জানি না, তবে ভুলভাতের জীবনে মেলেনি কোনো ভোররাতের সন্ধান। আর এভাবেই ভুলভাতগুলো আলো অন্ধকার অতিক্রম করে চলে আসে এই জনজীবনের কাছে। তাইতো পৃথিবীর সকল সত্য এসে ভুলভাতের দিকে তীর ছোড়ে আর রক্তাক্ত হয় ভুল জনগোষ্ঠীর পেটের অন্দর। তাইতো ভুল ভূখণ্ডের ওপর ভুলভাতেরা দিনরাত কেঁদেছিল কারণ ভুলভাতের কাছে আজন্ম কোনো মানচিত্র ছিল না...

কারা যেন ভাত ভাত করে নিজের ক্ষুধা বন্ধক রেখেছিল তালপাতার খাঁচায়। আমরা সেসব ক্ষুধার্তদের খুঁজছি। পৃথিবী বিক্রি করে কিনে এনেছি গারদভরা পাগলামি। আর ওই যে ভানু মাঝি, চন্দ্রকাঁটায় কেটেছিল যার প্রাণ; পৃথিবীর ভাতগুলো তাকে বাবা বলে ডাকত। মাঘের অন্ধকারকে দেখেছি তার কপালে পরাত ভাতের তিলক। ভাঙা পূজার খাঁচা ভেঙে কারা যেন উত্তরে যাবে, ওরা কি কপাল ফাটা? আমরা বেরিয়েছি ফাটা কপালের সন্ধানে। বিশ্বাস কর, সূর্যের লোমকূপ থেকে আইনুন নেসার চন্দ্রগ্রহণ পর্যন্ত কোথাও কোনো ভাত বেঁচে নেই। আমরা ছত্রিশক্ষুধার শেষ ভাতচিহ্ন। আমাদের বুকের ওপর জবাই হয়েছে ভূখণ্ডের রক্তবতী চাঁদ। মাটির গলা ফেড়ে উড়ে গেছে একঝাঁক লাল কবুতর। তাইতো ফাটা কপালের জখমরেখাই আমাদের শেষ আশ্রয়। বলতো, রাতের শরীরে বাবলার কাঁটা পুঁতেছে কারা? আমরা ভাত, আমরা পাকস্থলীর উচ্চারণ, অন্ধকার ছিল আমাদের সত্যধ্যানের গুহা, আলো ছিল আমাদের পাগলামির সর্বশেষ পাগল। সত্যকে পাথর ভেবেছ? গলাকাটা সত্যের শব্দ উঠেছে প্রাণে, মাটির তিনচন্দ্র ফেড়ে দেখ গর্ভবতী ভাতগুলো ছিল আমাদের মা, তারা এখন পিঁপড়া হয়ে গেছে।

মরাকাটা ঘরে তোমরা কি ভাতের সাত ভাইকে দেখেছ? আমরা দেখেছি দোটানা নিশ্বাসের ভেতর শত শত ঘোড়ার দৌড়ঝাপ। তাইতো পৃথিবীর চতুর বালকের অন্তর কাটে ভাতের পিঁপড়া। কে ভেঙেছে ত্রিকালের মাথা? জামপাতাগুলো পাগলামি করে বলে ঝাবু নাপিত ফাটিয়েছে পৃথিবীর মাথা। তাইতো আমরা পূর্ব পশ্চিম ক্ষুধার জন্য বাঁচি। গতকাল পাহাড়ি কন্যার পাকস্থলীর প্রাচীর ভেঙেছে, আর জন্মমৃত্যুর ফাঁক দিয়ে ভাতের কান্না কুড়াল মেরেছে পৃথিবীর পায়ে। পৃথিবীতে এত অন্ধকার কেন? প্রাণের কাচারি থেকে পালিয়ে যাওয়া ফাঁসির ঘোড়াটা কি তবে আলো? যে কোনো আলোই রাতের গা কাটা রক্ত। উল্টো পথের ময়ুরকাটা ছায়ায় কে চেয়েছ নতুন ভাতের বীজ? আমরা থাকি ফাটা কপালের ফাঁকে, তবুও গ্রহ নক্ষত্র আঁচড় কাটে অবলা ভাতের গায়ে...

পঞ্চাশ

ভাতের শেষ বচনের কথা আটকে গেল শেষ নিশ্বাসের সরু গলিতে। আমরা এতকাল শুনেছি খনার বচন, অথচ ভাতের বচন নাকি আমাদের দেহের ভেতর দিনরাত তোলপাড় করে। তবে কি ভাতেরও কোনো দুঃখ আছে? দেহ মৃত্যু সাপ কার ভেতর জেগে আছে ভাতের দুঃখ? বহুদিন আগে পুরনো এক থালার ওপর একটা ভাতকে বেদম হাসতে দেখেছিলাম, প্রাচীন হাঁড়ির ভেতর নাকি ওই ভাত শিখেছিল এমন হাসি। কেন যে হেসেছিল ওই ভাতের অন্তর! প্রাচ্যের গোলা ঘরে তো এমন হাসি থাকার কথা নয়। তবু কেন ভাতের হাসি হতে চায় ভূখণ্ডে হাওয়া? তবে কি ভাতের অন্তরে বড় বড় চুল জেগেছিল? মালোদের কুঁড়েঘরে বাস করত এসব ভাতের আত্মা, আর সে আত্মা যেদিন গ্রহ নক্ষত্রের ডাকে দ্বিখণ্ডিত হলো সেদিনই ভাসমান প্রাচ্য কাঁপতে শুরু করল, প্রাচ্যের পেটের ভেতর আজন্ম বৃক্ষ নদী পাহাড় অস্থির হয়ে উঠল। কার কাছে গিয়ে বলি এ অস্থির ভূখণ্ডের উপাখ্যান। যে ভূখণ্ডের সর্বস্তরে জীবিত মৃত ভাতগুলো মুখে রক্ত উঠে মরে। ফেটে যাচ্ছে এখানকার মাটি ও ভাতের বুকের ছাতি। কী নিদারুণ শব্দে দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাচ্ছে ভাতের ভূখণ্ড। আর ভাতগুলো সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে গেছে ভূগোলের উপরিভাগে। শুনে দেখ, কোনো কোনো ভাতের চোখ উপড়ানো আত্মচিৎকার। আর এভাবেই অন্ধ ভাতগুলো সহস্র কালের ব্যথা নিয়ে গলায় দিল ফাঁসি...